শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস
১১।১, কর্ণওয়ালিস্
কলিকাতা

নিবেদন

আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা ভূগোল পড়িতে যাইয়া সাহারা মরুভূমির একটা নীরস বর্ণনা পড়ে, ঐ বর্ণনা হইতে তাহারা সাহারা সম্বন্ধে বিশেষ কোন একটা ধারণা করিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। কি ইংরাজী, কি বাঙ্গালা, ভূগোল বিষয়ক পাঠ্য গ্রন্থে সাহারার সম্বন্ধে তেমন ভাবে আলোচনা নাই। অথচ যে সকল পণ্ডিতেরা সাহারা ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা সাহারা সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন কথা বলিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলেন যে—সাহারাকে যেরূপ সীমাহীন মরুপ্রান্তর বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সাহারার বিস্তৃতি সেইরূপ নয়। আর্ডার নামক মালভূমির পথে অগ্রসর হইলে অনেক নদীর শুষ্কখাত দেখা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নদীর তটদেশ তৃণসমাচ্ছন্ন, উপত্যকাভূমিও তৃণমণ্ডিত। আবার মালভূমির কোথাও কোথাও শাক-সজী পর্য্যন্ত জন্মে। এ সকল উচ্চ মালভূমি দেখিলে মনে হয় না যে সাহারার সর্ব্বত্রই অনুর্ব্বর মরুপ্রান্তর। আবার সাহারার কোন কোন স্থানে ৬ ইঞ্চি হইতে ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাতও হয়। এই সকল স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়, নানা জাতীয় হরিণ, শূকর, জিরেফা, সিংহ ও হস্তী দেখা যায়।

সাহারা মরুভূমির অধিকাংশ স্থান যে তৃণসমাচ্ছন্ন এবং জীবজন্তুর বাসের যোগ্য—একথা যেমন আশ্চর্য্যজনক, তেমনি বিস্ময়ের কথা এই যে পাষাণ-যুগে (Neolithic or stone Age) সাহারার মরু-প্রান্তরে মানুষ বাস করিত। কোন কোন ফরাসী পর্য্যটক সাহারার মরুবুকে সমাধি-মন্দির, পর্ব্বতের গাত্রে মানুষের হাতে খোদাই বহুবিধ প্রাণিমূর্ত্তি ও অনেক প্রকার চিত্রাদি দেখিয়াছেন। এমন কি শস্যপেষণের জন্য সেকালের অধিবাসীরা যে সকল জাঁতার ব্যবহার করিত, যে সকল প্রস্তরময় কুঠার ব্যবহার করিত, সে সমুদয় কুঠার ও তীর ফলকের ভগ্নাংশ কত কি সব পাওয়া গিয়াছে।

রাজকীয় ভূগোল বিভাগের (The Royal Geographical Society)র প্রকাশিত পত্রিকায়, The National Geographic Magazineএ সাহারা সম্বন্ধে প্রায়ই অনেক নূতন নূতন কথা প্রকাশিত হইয়া থাকে। সে সমুদয় প্রবন্ধ পড়িলে সাহারার বিষয়ে অনেক নূতন নূতন কথা জানা যায়।

আমি এলাহাবাদ পাব্‌লিক লাইব্রেরীতে সাহারা সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পড়িয়া বড়ই আনন্দ পাইতাম, তখন আমার মনে হইয়াছিল যে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য সাহারার সম্বন্ধে একটা গল্প লিখিলে, তাহারা গল্পের ভিতর দিয়া সাহারার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে ও শিখিতে পারিবে।

আমি সেই উদ্দেশেই 'সাহারার বুকে' লিখিয়াছি। কোন একখানি বিশেষ গ্রন্থ অবলম্বনে এই বইখানা লিখি নাই, তবে আখ্যানভাগ বিশেষ করিয়া "Through Desert sands"; or "Captives in the Sahara" হইতে লইয়াছি এবং সাহারার নানা বর্ণনা ইত্যাদি সাহারা সম্বন্ধে লিখিত অনেক গ্রন্থ হইতে লইয়াছি—এইজন্য বিশেষ ভাবে সেই সকল লেখক ও গ্রন্থকারদিগের নিকট ঋণ স্বীকার করিতেছি।

আমাদের দেশের বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীরা যদি অশোক ও দীপকের Adventure ও তাহাদের বিপদের কথা পড়িয়া আনন্দ পায় তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব। একান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে বাঙ্গালা সাহিত্যে 'সাহারা' সম্বন্ধে কোন বই আজ পর্যন্তও প্রকাশিত হয় নাই। সে হিসাবে 'সাহারার বুকে' প্রথম গ্রন্থ, এ কথা বলা যায়। আমি গল্পের ভিতর দিয়া সাহারা সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার ও শিখিবার আছে, সে সব কথাই বলিয়াছি, এবং তাহারা যাহাতে আনন্দ পায়, সে জন্য অনেক চিত্র সংযোজিত করিয়াছি। বহির ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত মলাটখানা 'শিশু-ভারতী'র চিত্রশিল্পী শ্রীমান সুধান সাহার অঙ্কিত। বাঙ্গালার কোন কবি মরুভূমির উপর কোন কবিতা লেখেন নাই, বোধ হয় অভিজ্ঞতার অভাবই তাহার কারণ, তবে দু'চারি লাইন কবিতা বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত—'ঐ আকাশ পরে আঁধার মেলে কি খেলা আজ খেল্‌তে এলে' সঙ্গীতটি রবীন্দ্রনাথের এবং অষ্টম অধ্যায়ের 'কেবল অনল ভার বহে সমীরণ' প্রভৃতি পংক্তি কয়টি গিরিশচন্দ্রের।

'নীলনদের দেশে' যেমন ছেলেমেয়েদের সকলেরই ভাল লাগিয়াছে, আমার বিশ্বাস **'সাহারার বুকে'**ও তাহাদের খুবই ভাল লাগিবে। **'আরব-বেদুইন'** প্রকাশিত হইলেও আমার তরুণ বন্ধুদের নিশ্চয়ই মনোরঞ্জন করিবে এইরূপ ভরসা করি।

আমি এই গ্রন্থ রচনায় বিশেষ ভাবে—The Great Sahara by Canon Tristram, The Country of the Dwarfs by Paul du Chaillu, Three years in the Libyan Desert by E. J. C. Falls, In the Heart of Africa by Duke of Mecklenburg, The vegetation of the central Sahara by Dr. T. F. Chipp (The Geographical Journal, August 1930), The sand Dunes of the Libyan Desert (The Geographical Journal, April, 1910). এই সব পুস্তক ও পত্রিকা ইত্যাদি হইতে সাহায্য পাইয়াছি।

পি. ৬৫১এ, মহানির্ব্বাণ রোড,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা
১৭ই আশ্বিন, ১৩৪৩

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সূচীপত্র

চিত্র-সূচী

ত্রিবর্ণ-চিত্র

একবর্ণ চিত্র

মরু-যাত্রী

প্রথম অধ্যায়

সমুদ্রের কোলে—জাহাজ-ডুবি

—কোন ভয় নেই, অশোক, কোন ভয় নেই দীপক! আমাদের ভেলা এখনি তৈরী হ'য়ে যাবে। তারপর সাগরও অনেক শান্ত হয়ে এসেছে। আর বোধ হয় দশ পনেরো ক্রোশ দূরেই ডাঙ্গা মিল্‌বে।

কথা হইতেছিল একটি ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের ভদ্রলোক আর দুইটি বালকের মধ্যে। মাণ্টা যাত্রী একখানি ইটালিয় জাহাজের ভাসমান কাঠ ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম হইতে একখানা মজবুত কাঠের ভেলা তাহারা তৈরী করিতেছিল। তাহাদের সম্মুখেই একখানা জাহাজ অর্দ্ধমগ্ন অবস্থায় কাৎ হইয়া পড়িয়াছিল। ঢেউগুলি নাচিতে নাচিতে আসিয়া জাহাজখানিকে আঘাত করিতেছিল। মাণ্টাগামী জাহাজের এই তিনজন যাত্রী মনে ভাবিতেও পারে নাই যে, তীরের একরূপ কাছাকাছি আসিয়া তাহাদের এইরূপ বিপদের

মুখে পড়িতে হইবে। তটরেখা যখন জাহাজের বুক হইতে বেশ ক্ষীণ ভাবে দেখা যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে একদিন বিকেল বেলা একটা ভীষণ ঝড় আসিয়া দেখা দিল। ঘন কালো মেঘে নীল আকাশ ছাইয়া ফেলিল। মেঘ গর্জ্জন করিতে লাগিল। বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। আর কড়্ কড়্ কড়্ বজ্রের কি ভয়ানক শব্দ! বাতাস অতি বেগে বহিতে লাগিল, শান্ত সমুদ্রের বুকে প্রমত্ত তরঙ্গরাজি—মাথা তুলিয়া হুঙ্কার দিতে লাগিল। যাত্রীরা ভয়ে ও বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল—'রক্ষা কর! রক্ষা কর দয়াময়!' এই বিপদের হাত হইতে উদ্ধার কর। ডেকের উপর দিয়া ঢেউগুলি হেলা-দোলা করিতে লাগিল। জাহাজখানি প্রলয়ের সেই ঢেউয়ের তালে তালে নাচিতে নাচিতে হঠাৎ গন্তব্য পথ হইতে সরিয়া গিয়া ত্রিপলির তীরের কাছাকাছি বালুর চরে ঠেকিয়া কাৎ হইয়া পড়িল।

এই জাহাজ ডুবির পরে—জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে কে বাঁচিল, কে মরিল, তাহার খোঁজ করিবার লোক বড় একটা রহিল না। অশোক ও দীপক দুই ভাই ও তাহাদের কাকা কাপ্তেন প্রমোদ সেন কোনরূপে এই ঝড়ে পড়িয়াও বাঁচিয়াছিলেন।—সারারাত্রি তাহারা চরার দিক্‌কার আধ ডুবো জাহাজের পাটাতনের উপর রাত কাটাইয়াছিলেন। সে কি ভীষণ রাত্রি! ঘন অন্ধকার! সে ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে কিছুই দেখা যায় না। কাপ্তেন সেন ছেলে দু'টিকে আগুলিয়া ধরিয়া শুধু প্রভাতের আলোর আশা করিতেছিলেন। মানুষ অন্ধকারে ভয় পায়, কিন্তু আলোতে সাহস ও ভরসা পায়। সে রাত্রিতে একটিও তারা দেখা যায় নাই। যেমন কালো মেঘ আকাশে হুঙ্কার দিতেছিল, তেমনি কালো অন্ধকার চারিদিকে প্রলয়ের আগমনী গান গাহিতেছিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমকানিতে দেখা যাইতেছিল কালো সমুদ্রের তরঙ্গমালা সাপের ফণার মত ফণা তুলিয়া রুষিয়া শ্বসিয়া আসিতেছে। রাত কাটিয়া গেল, ক্রমে যেমন বেলা বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে মেঘ কাটিয়া গেল, ঝড় থামিল এবং চারিদিক পরিষ্কার হইয়া গেল। ক্রমে সূর্য্য দেখা দিলেন। সেই প্রভাতে তাহারা তাহাদের অবস্থাটা বেশ পরিষ্কার- ভাবে বুঝিতে পারিল। কাপ্তেন প্রমোদকুমার দেখিলেন যে, যদি তাহারা একখানি ভেলা তৈরী করিয়া কোনও প্রকারে তাহাতে ভাসিতে পারেন, তাহা হইলে

ঐ যে নীল পাহাড় দেখা যাইতেছে--ঐ যে ক্ষীণ সবুজ-শ্রী দেখা যাইতেছে, ত্রিপলির তটদেশে, সেখানে পৌছিবার সুযোগ ঘটিবে নিশ্চয়ই। নতুবা এই নিমজ্জমান জাহাজের পাটাতনের উপর আর কতটুকু সময়ই বা আশ্রয় মিলিবে।

বালক দুইটি তরুণ কিশোর। একটির বয়স তেরো আর একটির বয়স পনেরো হইতে পারে। বালক হইলেও তাহারা কাতর হইয়া পড়ে নাই, কাকার উপরে তাহাদের অগাধ বিশ্বাস। কাকা যখন সঙ্গে আছেন, তখন নিশ্চয়ই বিপদ কাটিয়া যাইবে, কোন না কোনরূপে আশ্রয় মিলিবেই।

কাপ্তেন সেন বলিলেন,—আফ্রিকার জল-দস্যুরা বোধ হয় এখন পর্যান্ত জানতে পারেনি যে, জাহাজ ডুবি হয়েছে, তাহ'লে কি আর তারা নিশ্চিন্ত থাক্‌ত? এতক্ষণে জাহাজের জিনিষপত্র যা পারত সবই লুট করে নিয়ে যেত। আমাদের প্রয়োজন মত খাদ্য যা পেরেছি, তা সংগ্রহ করেছি। অন্ততঃ সাত দিন আমরা খেয়ে বাঁচব।

অশোক কহিল—কাকাবাবু! কাপ্তেন ফেবোনিব জন্য কিন্তু আমার বড় দুঃখ হয়, বেচারা শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণ করেছিল। শেষটায় মাস্তুলটা কি-না ভেঙ্গে পড়লো কাপ্তেনের মাথায়! তারপব কি যে হলো, সে ত আর জানতেই পারলেম না।

দীপক কহিল-- দাদা, বাবা ত আর জানেন না আমাদের জাহাজ ডুবি হয়েছে, তিনি হয়ত আশা করে আছেন আমরা শীঘ্রই পৌছে যাব। যখন জাহাজ ডুবির খবরটা পৌছবে, তখন তিনি মনে করবেন যে আমবাও হয়ত মারা গেছি?

কাপ্তেন সেন বলিলেন,—দাদা সাহসী মানুষ, তিনি সহজেত আর কোন কিছুতে ভয় পান না। তবে এমন একটা আকস্মিক বিপদের সংবাদে যে ভয় পাবেন, সে ত স্বাভাবিক। কাজেই যেমন করে হয় আমাদের দাদার কাছে তাড়াতাড়ি ফিরে যাবার চেষ্টা করতে হবে।

অশোক ও দীপকের বাবা মেজর কল্যাণ সেন সেবারকার যুদ্ধে অসাধারণ সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেওয়ায় মেজর হইয়াছিলেন। কঠিন পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আর তিনি সাধারণ বাঙ্গালীর মত ছিলেন না। নূতনের পথে চলাই ছিল তাঁর স্বভাব। মেডিকেল কলেজ হইতে বাহির হইবার পর, তিনি এক সমুদ্রগামী জাহাজেব ডাক্তার হইয়াছিলেন।

তারপর সেবারকার মহাযুদ্ধে যোগদান করিয়া তিনি ইরাক আসেন। রণক্ষেত্রে মাথার উপর দিয়া উড়োজাহাজ বোঁ বোঁ বন্ বন্ করিয়া উড়িয়াছে—গুলির পর গুলি সাঁই সাঁই করিয়া ছুটিয়াছে, তিনি এতটুকু ভয় পান নাই। যুদ্ধ-শেষে সম্মান, অর্থ, যশঃ—এই তিনই তাঁহার লাভ হইয়াছিল। ছেলেবেলাকার এই দুঃসাহসী বালক চল্লিশ বৎসর বয়সের পরেও জীবনকে নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আফ্রিকার মরুভূমি তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। মিশরের পিরামিড্ জাগাইয়া দিত তাঁহার মনে সেই হাজার হাজার বছর আগের ফ্যারোয়াদের বিচিত্র রহস্যপূর্ণ কাহিনী। নীল সলিল—নীলনদের উৎস-সন্ধানে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিত! কতদিন ভাবিতেন লিভিংষ্টোন্, ষ্টান্‌লী, বার্টন যাহা পারিয়াছে, আমরা কি তেমন কোন নূতন দেশ বা নূতন কিছুর সন্ধান করিয়া বাঙ্গালী জাতির নাম ইতিহাসের পাতায় অমর করিয়া যাইতে পারিবনা! তাই যুদ্ধের পর মেজর সেন—তাহার ছেলে দুটিকে দেশ হইতে আফ্রিকায় আসিতে লিখিয়াছিলেন। এ সময়ে তিনি মাল্টার রাজধানী ভ্যালেটাতে (Valletta) বাস করিতেছিলেন. —কেননা শীতের সময়টা তাঁহার শরীর বিশেষ ভাল থাকিত না সেইজন্য হাওয়া বদলাইবার জন্য তিনি চিকিৎসকের পরামর্শে শীত কালটা মাল্টাতেই কাটাইতেন। মাল্টা—ভূমধ্যসাগরের একটি দ্বীপ। এই দ্বীপটি ব্রিটিশ-রাজ্যভুক্ত। সিসিলি দ্বীপের প্রায় ষাট মাইল দূরে এই দ্বীপটি অবস্থিত। এখানে ইংরাজদের ভূমধ্যসাগরের অন্তর্গত বিখ্যাত নৌ-বহর আছে এবং কৃষিদ্রব্য, মধু ও মৎস্য ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

মেজর সেন—এইখানে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবেন কিংবা মরুভূমি-অভিযানকারী কোনও যাত্রী দলের সহিত মিশিয়া মরুভূমির বালুর মধ্য হইতে কোনও লুপ্ত নগরীর গুপ্তধনের সন্ধান করিবেন, কিংবা কোনও নূতন অজানাদেশ আবিষ্কার করিবেন—এই ছিল তাঁহার মনের ইচ্ছা। সেজন্যই কনিষ্ঠভ্রাতা কাপ্তেন প্রমোদকুমারকে ছেলে দু'টিকে লইয়া মাল্টা আসিতে পত্র দিয়াছিলেন। এখানে কাপ্তেন প্রমোদ সেন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতেছি। দেশে ভাল ভাবে পাশ করিয়া পরে ডাক্তারী শিখিবার জন্য বিলাত হইতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসে চাকরি করিতেছিলেন, কাপ্তেন সেন দাদার কথায় এক বৎসরের ছুটি লইয়া ভাইপোদের

সঙ্গে নানা দেশ দেখিতে দেখিতে মাল্টার পথে আসিতেছিলেন। পথে জাহাজ-ডুবির কথা তোমরা জানিয়াছ। মেজর ছিলেন বিপত্নীক। ছেলে দুইটি তাঁহার কলিকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলের বাড়ীতে থাকিয়া ইস্কুলে পড়িত। মেজর সেনের বাড়ী ছিল বিক্রমপুর। পদ্মা নদীর তরঙ্গ-লীলায় তাদের বাস্তু-ভিটা চিরদিনের জন্য নদীর অতলে ডুবিয়া যাওয়ায় বাধ্য হইয়া কলিকাতাতে বাড়ী করিয়া সেখানেই বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নতুবা তিনি হয়ত গ্রামেই বাস করিতেন। দুই ভাই বিদেশে থাকিতেন, কাজেই সেন ভ্রাতাদের বৃদ্ধ মাতুল সপরিবারে বালিগঞ্জের বাড়ী থাকিয়া ছেলে-দু'টির দেখাশুনা করিতেন আর প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহারই সমবয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধদের সঙ্গে গল্প করিয়া বেড়াইতেন। —হঠাৎ মেজর সেনের মনে হইল যে, ছেলে দু'টিকে শুধু বিলাসের মধ্য দিয়া মানুষ করিলে তাহারা দৃঢ়, সবল ও কর্ম্মঠ মানুষ হইবে না! তাহাদের বিপদের ভিতর দিয়া মানুষ করিতে হইবে। দেশ বিদেশে না ঘুরিলে, নানা দেশের নানা জনের সহিত না মিশিলে, নানা দেশের নানা ভাষা না শিখিলে, দুর্গম গিরিশিরে, ধূ-ধূ-ধূ-ধূ মরুভূমির তপ্ত বালুকাময় প্রান্তরে, সাগরের তরঙ্গ- দোলায় না দুলিলে কেমন করিয়া তাহারা মানুষ হইবে? তাই তিনি ইউরোপীয় নানা ভাষায় উপযুক্ত শিক্ষক রাখিয়া ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন। অশোক ও দীপক ফরাসী, ইংরাজী, ইটালী, জার্ম্মেণ, হিন্দী, উর্দ্দু, এসব ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে শিখিয়াছিল! একটা নূতন কিছু করিবার আশায় সেন-মহাশয় পৃথিবীর সব Explorers (আবিষ্কারক) দের জীবন-চরিত পড়িতেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার মনে নানা দেশের বিচিত্র রূপ স্বপ্নের ছবির ন্যায় আসিয়া চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিত। এ গেল—পূর্ব্বের কথা।

এদিকে অশোক, দীপক ও কাপ্তেন সেন যেমন কথা বলিতেছিলেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কাজ ও করিতেছিলেন। তাহারা মাস্তুল, পাটাতনের কাঠ, পেরেক এই সব যোগাড় করিয়া কাঠের একখানি মজবুত ভেলা তৈরী করিতেছিল। এমন সময় কাপ্তেন সেন হঠাৎ প্রায় এক মাইল দূরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে কয়েকজন লোককে চলাফেরা করিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া তাঁহার মনে ভয় হইল, এবং বুঝিতে পারিলেন যে মূর-জলদস্যুদের কানে জাহাজ ডুবির সংবাদ পৌঁছিয়াছে। সেন বলিলেন-- অশোক, দীপক

— ঐ দেখ দূরে কয়েকটি লোক দেখা যাচ্ছে! এইবার তাড়াতাড়ি ভেলা ভাসাও। যদি এদের হাতে পড়ি তা হলে আর প্রাণে বাঁচব না।—

কি আর করা! ভেলার কাজ কোনরূপে শেষ করিয়া তাহারা তিনজনে সমুদ্রের জলে ভেলা ভাসাইয়া দিল। অশোক ও দীপক দাঁড় টানিতে লাগিল। প্রমোদ সেন হাল ধরিলেন। তাহারা পদ্মাপাড়ের লোক, ছেলেবেলায় পদ্মার ঢেউয়ের কোলে কোলে ডিঙ্গি ভাসাইয়া বেড়াইয়াছে। শান্ত সমুদ্রের বুকে ভেলায় চড়িয়া যাইতে তাহাদের কোন ভয় হইল না। বরং বিপদের মধ্যে জীবন-লাভ, তারপরে এই নূতন অভিযান তাহাদের প্রাণে আনন্দের সাড়া জাগাইয়া দিয়াছিল। নীল নির্ম্মল আকাশে দীপ্ত সূর্য্য, আর সূর্য্য কিরণে সমুদ্রের ঢেউগুলি হীরার মত জ্বলিতেছিল। তাহাদের ভেলা নাচিতে নাচিতে ভাসিতে ভাসিতে ডুবো জাহাজের কাছ হইতে অনেক দূরে চলিয়া আসিল। অশোক ও দীপক দাঁড়ের তালে তালে গাহিতে লাগিল—

ঐ আকাশ-পরে আঁধার মেলে কি খেলা আজ খেল্‌তে এলে
তোমার মনে কি আছে তা জান্‌ব না।
আমি তবুও হার মান্‌ব না, হার মান্‌ব না।
তোমার সিংহ ভীষণ রবে,
তোমার সংহার উৎসবে,
তোমার দুর্য্যোগ দুর্দ্দিনে—
তোমার তড়িৎ-শিখার বজ্র লিখায় তোমায় লব চিনে,—
কোন শঙ্কা মনে আনব না গো আন্‌ব না।
যদি সঙ্গে চলি রঙ্গভরে কিম্বা পড়ি মাটির পরে
তবুও হার মান্‌ব না—হার মান্‌ব না।

এমন সময় দূরে অনেকগুলি ঝুপ্ ঝাপ্ ঝুপ ঝাপ্ করিয়া দাঁড়ের শব্দ শোনা গেল। আর একদল অজানা মানুষের অপরিচিত ভাষার স্বর, ক্রমশঃই যেন সে স্বর স্পষ্টতর হইতে লাগিল। সৌভাগ্য বশতঃ তাহাদের ভেলাখানি হঠাৎ একটা ঝট্‌কা হাওয়ার দরুণ ডুবো জাহাজটার পাশে আসিয়া পড়ায় দূর হইতে মূরেরা তাহাদিগকে দেখিতে পায় নাই।

তবু একজন আরব তাহাদের উদ্দেশে লক্ষ্যহীনভাবে একবার একটা বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল। শেষটায় বোধ হয় তাহারা মনে করিল যে, এই নিরীহ ও বিপর্য্যস্ত দু' চারজন যাত্রীর পেছনে না যাইয়া ড়ুবো জাহাজটা অর্দ্ধেক ড়ুবো অবস্থায় থাকিতে থাকিতে লুটের ব্যবস্থা করাই ভাল।

অনুকূল পবনে তাহাদের ভেলাখানি নিরাপদে ভাসিতে ভাসিতে তীরের দিকে ছুটিয়া চলিল। এখানে সমুদ্রের জল অগভীর, কাপ্তেন সেন বলিলেন— এখন আর ঢেউ উঠিবার কোনও সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে।

সূর্য্যের কিরণে তাহাদের ভিজা কাপড়-চোপড় শুকাইয়া গিয়াছিল, শীতের দরুণ তাহাদের কাঁপিতে কাঁপিতে রাত কাটাইতে হইয়াছে, হাত পা একেবারে অসাড় ও অবশ হইয়া গিয়াছে। নূতন দিনের নূতন আলো যেন নূতন আশার কথা লইয়া আসিয়া তাহাদের সতর্ক করিয়া দিল।

সমুদ্রের তটরেখা ক্রমশঃই নিকট হইতেও নিকটতর হইতেছিল। বালক দুইটি সাহসী হইলেও পরিশ্রমে ও অনিদ্রায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। এইবার তট দেশের শ্যামল-শ্রী দেখিয়া তাহারা আনন্দিত হইল।

সমুদ্র এখানে একটা পাহাড়ের কাছ দিয়া বাঁকিয়া গিয়াছিল। ঐ বাঁকের পরেই সিন্ধু-তীরে ধূসর গিরিশ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পাহাড়ের গায়ে খেজুর গাছের সারি। সে গাছের যেন আর শেষ নাই। সাগরের ঢেউয়ের যেমন অফুরন্ত গতি, একটির পর একটি—তার পর একটি, সীমা নাই—শেষ নাই, এও ঠিক্ তেমনি ঢেউয়ের মত স্তরে স্তরে গাছেরা সব সার বাঁধিয়া পাহাড়ের গা সবুজ করিয়া রাখিয়াছে। এই গিরিশ্রেণীর পর উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী। সে পর্ব্বতে কোথাও গহ্বর, কোথাও উপত্যকা। চূড়াগুলি বন্ধুর, অনুর্ব্বর। আফ্রিকার উত্তর উপকূলের এই পর্ব্বতশ্রেণী অনেক দূর হইতেই দেখা যায়। মরুভূমির নির্ম্মল বায়ু আসিয়া তাহাদের কানে কানে নূতন দেশের নূতন কাহিনী শুনাইতেছিল। একেবারে তীরের কাছে যখন তাহারা আসিল, তখন দেখিতে পাইল বালুকাকীর্ণ পথের উপর দিয়া উটের সারি সার বাঁধিয়া চলিয়াছে। দূর হইতে দেখা যায় যেন একগাছি মালা দুলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। তাহাদের পিঠে চড়িয়া

মরুভূমির যাত্রী আরবেরা চলিয়াছে—মহাপিপাসার রঙ্গভূমির দেশে। ক্রমে ক্রমে ভেলাখানি ভাসিতে ভাসিতে যখন তীরের অতি নিকটে আসিল—তখন সেই পূর্ব্বের দেখা পাহাড় শ্রেণী আরও অনেকটা পিছাইয়া গেল। সেই মরুযাত্রীর দল অদৃশ্য হইল। বিপন্ন যাত্রীরা এইবার দেখিতে পাইল—সাদা প্রাচীর ঘেরা ত্রিপলি সহরের দৃশ্য। প্রাচীরের ভিতরে মসজিদ ও অট্টালিকার চূড়া আকাশ ছুঁইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঠিক্ যেন নীল আকাশের গায়ে আঁকা ছবিটির মত।

প্রমোদ সেন বলিলেন—অশোক, দীপক, শোন,—ঐ দেখ সম্মুখেই ত্রিপলির বন্দর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কেমন করে বন্দরে প্রবেশ করবো, সেই হচ্চে যে মস্ত ভাবনা।

কথাটা তিনি মিথ্যা বলেন নাই। ত্রিপলির কাছে পাষাণ-প্রাচীর ভীষণ ভাবে খাড়া হইয়া আছে। সমুদ্রের ঢেউ এখানে এত জোরে আসিয়া আঘাত করে যে, তাহার সেই স্রোতোবেগে পড়িলে যে কোন মুহূর্ত্তে বিপদ ঘটিতে পারে। এজন্য কি জাহাজ, কি নৌকা, কি ষ্টীমার সমুদয়ই বন্দরে ভিড়াইবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। আবার এই অগভীর সমুদ্র তীরে নিমজ্জমান শৈলখণ্ড থাকায় আরও ভয়ানক বিপদ। ইহাদের ভেলাখানি স্রোতোবেগে ঢেউয়ের তালে তালে নাচিতে নাচিতে যাইতেছিল। কাপ্তেন সেন অত্যন্ত সতর্কতার সহিত এই বিপদ-সঙ্কুল স্থান দিয়া উহা চালাইয়া নিতেছিলেন, কিন্তু অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা যে একটা বাঁক ফিরিবার সময় ভেলাটি একটা পাহাড়ের গায়ে যাইয়া ধাক্কা লাগিবার মত হইলে তিনি যেমন দাঁড়খানি দিয়া উহা ঠেলিয়া দিবেন, অমনি খুব জোরে একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেলাখানি এমন করিয়া আন্দোলিত করিল যে, তিনি কোনরূপেই আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না ;—দপ্ করিয়া ভেলার উপর পড়িয়া গেলেন।—দীপক ও অশোক প্রথম অবস্থায় ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি যখন আর কিছুতেই উঠিলেন না, তখন তাহাদের মনে ভয় হইল যে, ব্যাপারটা গুরুতর হইয়াছে। দুইজনে তাড়াতাড়ি কাকার কাছে আসিয়া দেখিতে পাইল যে, একটা পেরেক লাগিয়া তাঁহার মাথা কাটিয়া গিয়াছে এবং সেখান হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত হইতেছে। অশোক বলিল—দীপক তোমার রুমালটা দাও, কাকার মাথা কেটে গিয়েছে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।

অশোক, দীপকের কাছ হইতে রুমালখানি লইয়া মিঃ সেনের মাথাটা বাঁধিয়া দিল। দীপক সতর্কভাবে দাঁড়খানি দিয়া ভেলাটিকে দূরে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে লাগিল। এইভাবে তাহারা ধীরে ধীরে বন্দরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কাপ্তেন সেন মুমূর্ষুর মত পড়িয়া রহিলেন।

দুইটি তরুণ কিশোর কি যে করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় দেখা গেল একখানা ছোট ষ্টীমার বন্দরের দিকে আসিতেছে। অশোক ও দীপক তাহাদের টুপি তুলিয়া, কোট খুলিয়া লইয়া লঞ্চখানাকে কাছে আসিবার জন্য ইসারা করিতে লাগিল। কিন্তু লঞ্চখানা সেদিকে কোনও লক্ষ্য না করিয়াই ছুটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা দুইজনে কোনমতেই হাল ছাড়িল না, পূর্ব্বেরই মত নিশানা করিতে লাগিল। অবশেষে লঞ্চখানা তাহাদের দিকে আসিল।

লঞ্চখানাকে কাছে আসিবার জন্য ইসারা করিতে লাগিল

লঞ্চখানার উপর তুর্কীদের অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি পতাকা উড়িতেছিল— ষ্টীমারের মধ্যে একজন স্থূলকায়, বয়স্ক তুর্কী ভদ্রলোক একখানা আরাম-কেদারায় বসিয়াছিলেন। তাহার মাথায় রক্তবর্ণের তুর্কী টুপী এবং গায়ে নীল রঙের তুর্কী সৈন্যদের পোষাক ও মুখে লম্বা দাড়ি।
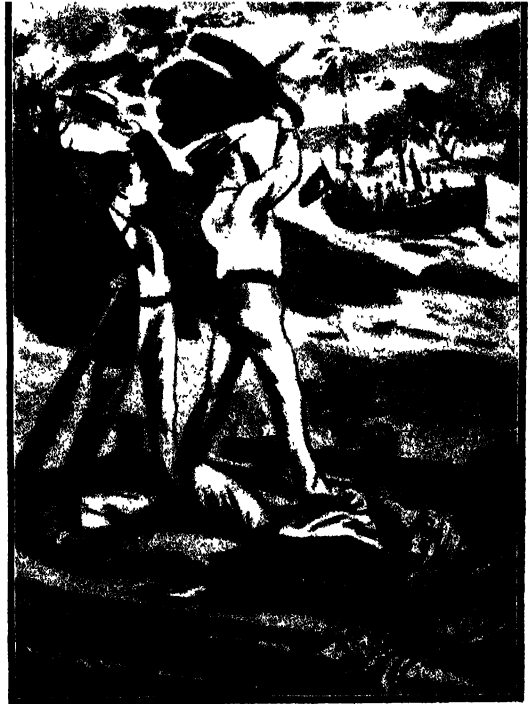
লঞ্চখানি তাহাদের ভেলার কাছে আসিয়া পাশাপাশি ভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইল, দীপক অশোককে কহিল—দাদা আর ভয় নাই—কাকার জীবন রক্ষার উপায় হল।—

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই জাহাজের ভিতর হইতে একজন আরব সম্ভবতঃ সে বয়স্ক ভদ্রলোকটির কেরাণী। সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইটালী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা কা'রা ? কোথা হ'তে এসেছ ?

এখানে একটা কথা বলিয়া লই---আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী বন্দরগুলিতে ইটালীয় ভাষার প্রচলন খুব বেশী, ছোট বড় সকলেই মোটামুটি ভাবে ইটালী-ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারে। ঐ স্থূলকায় ভদ্রলোকটি ত্রিপলি বন্দরের Harbour-master বা পোতাশ্রয় অধ্যক্ষ। তার সঙ্গের লোকটি তাহার কেরাণী এবং দ্বিভাষীর কাজ করে। অশোক ও দীপক লোকটিকে একে একে ইটালী ভাষায় সব কথা বুঝাইয়া বলিল। তুর্কী ভদ্রলোক তাহার কেরাণীর মুখে সব কথা শুনিয়া ছেলে দুটিকে এবং কাপ্তেন সেনকে ষ্টীমারে তুলিয়া লইবার আদেশ দিলেন।

ছোট জাহাজখানির উপরে উঠিলে পর দ্বিভাষী তাহাদের নিকট ত্রিপলীতে ঢুকিবার ছাড়পত্র (pass-port) দেখিতে চাহিল। দুইটি নিরীহ ছেলে যাহারা ঈশ্বরের নেহাৎ দয়ায় প্রাণে বাচিয়াছে এবং যাহাদের সম্বলের মধ্যে শুধু নিজের গায়ের কাপড়-জামা ছাড়া আর কিছুই নাই, তাহাদের নিকট ছাড়পত্র চাওয়া যে একটা হাসির ব্যাপার, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং আরবদেশীয় কেরাণীটি যখন ছাড়পত্রের দাবী করিল, তখন অশোক ও দীপক না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। লঞ্চখানার নাবিক ও মাল্লাগুলি এই দুটি গৌরবর্ণ সুন্দর বালককে এইরূপ ভাবে হাসিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। তুর্কী ভদ্রলোক ও তাহার কেরাণী তখন ঐরূপ ভাবে ছাড়পত্র চাওয়ার ব্যাপারটা হাসির ব্যাপার বলিয়াই মনে করিলেন।

লঞ্চখানি তীরে আসিয়া ভিড়িল। এ সময়ে কাপ্তেন সেনের জ্ঞান একটু একটু করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, তবে তাহার উঠিবার মত শক্তি একেবারেই ছিল না। দুইজন লোক একটি 'ষ্ট্রেচারে' করিয়া তাহাকে তীরে নাবাইয়া নিল, তারপর তুর্কী-কর্ম্মচারী নামিলেন, তাহার কেরাণী নামিল এবং সকলের শেষে অশোক ও দীপককে লইয়া দুইজন নিগ্রো কর্ম্মচারী বন্দরে নামিয়া আসিল। এ সময়ে কয়েকজন 'পুলিশ'ও আসিয়া তাহাদের সঙ্গী হইল। লোকগুলি এমন ভাব দেখাইতে লাগিল যেন এই দুইটি বালক গোটা

পৃথিবীটাকেই জয় করিতে আসিয়াছে। এদেশের পুলিশদের পোষাকও অদ্ভুত রকমের। একটা নোংরা কম্বল দিয়া সারা শরীর ঢাকা ও মাথার উপর ঘোমটার মত করিয়া ঝুলান। এইবার রাজপথ দিয়া এই অদ্ভুত শোভাযাত্রা সহরের দিকে অগ্রসর হইল। এই অদ্ভুত শোভাযাত্রা যখন সহরের পথ দিয়া চলিতেছিল, তখন ইহাদিগকে লইয়া বন্দরের মাঝি-মাল্লা, জেলে, সৈনিক, দোকানদার এবং অলস কুঁড়ে লোকগুলি, যাহারা নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানিতেছিল বা কাফি পান করিতেছিল তাহারা একটা অদ্ভুত গল্প রচনা করিয়া ফেলিয়াছিল। একটা লোক রাজপথের একধারে দাঁড়াইয়া একরূপ চেঁচাইয়াই বলিতেছিল—জান ব্যাপারটা কি? ঐ ছেলে দু'টো ঐ লোকটাকে মেরে ফেলেছে। এরা হচ্ছে জলদস্যু। ভাগিস্ আমাদের বন্দরের কর্তা ছিলেন, তাই এদের ধরে ফেলেছেন। এখন বাছাধনেরা কোড়া খাবেন, আর জেলে পচে মরবেন।

ঐ বাড়ীতে ব্রিটিশ-পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক্ উড়িতেছিল

অশোক ও দীপক আরবী ও কাফ্রীদের ভাষা জানিত না কাজেই তাহারা রাস্তার লোকগুলির মন্তব্য শুনিয়াও কিছু বুঝিতে পারে নাই। দুই ভাইয়ের মনে শুধু এই ভাবনাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাদের কোথায় লইয়া যাওয়া

হইতেছে । প্রায় এক ঘণ্টা পথ চলিবার পর তাহারা একটি সুন্দর সাদা বাড়ীর ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিল। ঐ বাড়ীর মাথার উপরে ব্রিটিশ-পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক্ উড়িতেছিল। গেটের দুইদিকে দুইজন ভীষণাকৃতি মূর-প্রহরী বন্দুক কাঁধে লইয়া পাহারা দিতেছিল। লোকগুলি অশোক ও দীপককে লইয়া একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাদের পায়ের শব্দ শুনিয়া একজন সুদর্শন ইংরেজ ভদ্রলোক সেখানে আসিলেন। এবং তাহাদের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন -- তোমাদের কি হয়েছে এবং তোমরা কা'রা ?

এই প্রশ্নের উত্তরে অশোক পরিষ্কার ইংরাজীতে তাহাদের সমস্তপরিচয় এবং জাহাজ-ডুবির কথা ও কাপ্তেন সেনের কথা ভদ্রলোকটিকে বুঝাইয়া বলিল। পরিচয়-প্রসঙ্গে তাহারা যে মেজর সেনের পুত্র এ কথাও বলিল।

মেজর সেনের নাম শুনিবামাত্র প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি চমকাইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, তোমরা মেজর সেনের ছেলে ?

বালকেরা বলিল—আজ্ঞে হাঁ।

--জান, তিনি ও আমি এক সঙ্গে অনেক দিন ইরাক ছিলাম। যুদ্ধে দুইজনে কত যে বিপদে পড়েছি, তার অন্ত নেই। অনেককাল মেজর সেনের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। যুদ্ধের পরে আমি এখানে ব্রিটিশ রাজদূত হয়ে এসেছি।-- সে কথা এখন থাক্।

তারপর তিনি সেই তুর্কী কর্ম্মচারী, তাঁহার কেরাণী এবং অন্যান্য লোকদের বিদায় করিয়া দিয়া বলিলেন -এস তোমাদের থাক্‌বার ও খাবার ব্যবস্থা করে দি। তোমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছ। তোমাদের অন্য সব কথা পরে শোনা যাবে।

দীপক কহিল---আমাদের কাকা, কাপ্তেন সেনের কি হবে তাহ'লে ?

ত্রিপলির এই ইংরাজ রাজদূতের নাম—মিঃ সার্প। মিঃ সার্প তাহাদের কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন---কোন ভাবনা নেই সেজন্য। আমার এ বাড়ীতে ত যায়গার কোনও অভাব নেই, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোমরা নিশ্চিন্ত হও।

এই ভাবে—জাহাজ ডুবির পর আফ্রিকার মাটিতে পা দিতে না দিতেই তাহাদের যে এমন নিরাপদ আশ্রয় মিলিবে, তাহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মূরদের সহরে

অশোক ও দীপক দু'চার দিনের মধ্যেই সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল। দুইজনেই দেখিতে অতি সুশ্রী এবং গৌরবর্ণ ছিল, এখন নূতন সহরে নূতন সাজসজ্জায় তাহাদিগকে লোকে ইংরাজ বালক বলিয়াই মনে করিত। মনে করিবার প্রধান কারণ ব্রিটিশ-কনসাল তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন।

কাপ্তেন সেনের অবস্থার কিন্তু বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। তাহার অবস্থাটা অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছিল। বন্দরের একজন বিজ্ঞ ইংরাজ ডাক্তার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন - রোগীর অবস্থা বড় সুবিধার নয়। খুব সাবধানে রাখা দরকার। হঠাৎ জীবন-নাশও হতে পারে।

ত্রিপলির ব্রিটিশ রাজদূত মিঃ সার্প খুব বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কাপ্তেন সেনের ব্যাপারটা লইয়া একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দেশী চাকর-বাকরদের হাতে রোগীকে ছাড়িয়া দিলে যে বিপদ ঘটিবে তাহা নিশ্চিত। তাহারা অৰ্দ্ধেক রাত্রি

ঘুমাইয়া কাটাইবে আর বাকী আধেক রাত্রি গল্প করিয়া কাটাইবে। আর এদিকে মিঃ সার্প ও তাঁহার সেক্রেটারীরও এমন অবসর নাই যে সরকারি কাজের অবহেলা করিয়া রোগীর সেবা-শুশ্রূষা লইয়া থাকিতে পারেন।

অশোক ও দীপক দুই ভাই কিন্তু মিঃ সার্পকে একটু চিন্তিত দেখিয়াই তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল --আপনি বোধ হয় আমাদের কাকার সেবা-শুশ্রূষা কি ভাবে চল্‌বে সেজন্য ব্যস্ত হয়েছেন! তা ব্যস্ত হবেন না। আমরা দুই ভাই কাকার সেবার ভার নোব।

মিঃ সার্প দুইটি বালকের হাতে এমন একজন কঠিন রোগীর সেবার ভার দিতে একটু শঙ্কা বোধ করিতেছিলেন। তাই প্রশ্ন করিলেন - তোমরা পারবে ত?

—কেন পারব না? নিশ্চয় পারব। বাবা যে আমাদের ব্যাণ্ডেজ বাঁধ্‌তে এবং সেবা-শুশ্রূষা (Nursing) সম্বন্ধে অনেক কিছু উপদেশ দিয়েছেন এবং নিজ হাতে শিখিয়ে দিয়েছেন।

মিঃ সার্প সহসা তাহাদের কথার উপর আস্থা স্থাপন করিতে না পারিলেও নিরুপায় হইয়া তাহাদের উপরই রোগীর শুশ্রূষার ভার দিলেন। তাহারা দুইজন দুই ঘণ্টা পর পর রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অশোক ও দীপকের কাজ করিবার ক্ষমতা দেখিয়া মিঃ সার্প আশ্চর্য্য হইলেন।

মিঃ সার্প দেখিলেন এই বালক দুইটির একদিকে যেমন চপলতা, অন্যদিকে তেমনি সব কাজ সময় মত করিবার দক্ষতাও আছে অসাধারণ। এই দুইটি কিশোর, রাজদূতের নীরব ও নিস্তব্ধ বাড়ীখানিকে হাসি ও আনন্দের কল-কল্লোলে একেবারে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। আর অশোক ও দীপকের কাছেও আফ্রিকার এই সহরের নূতনত্ব নানা ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। তাহারা কলিকাতা, বোম্বে, আগ্রা এবং আসিবার পথে আরও কয়েকটি বড় বড় সহর দেখিয়াছে। কিন্তু এই সহরটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। এ যেন স্বপ্ন-পুরী বোগ্‌দাদ! এ যেন খলিফাদের একটি পুরাণো রাজধানী। এ সহরের গম্বুজ, মিনারে, তোরণে প্রাচীরে, গৃহের দ্বারে, অলিন্দে, বাড়ীর সম্মুখের কাজ করা ছোট গোল বারান্দায়, ক্ষুদ্র বাতায়নে, চূড়ায়--যেন আঁকা রহিয়াছে একখানি পুরাণো ছবি।

সমুদ্রের দিকে প্রাচীর। সেই প্রাচীর মরুভূমির দিক্ পর্যান্ত সহরটিকে ঘিরিয়া আছে। আঁকা বাঁকা অপ্রশস্ত রাজপথ। গলি পথ ধূলি ভরা, নোংরা। সেগুলির কোনটিই সরল নয়, আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। দোকানগুলি বিশ্রী রকমের এলোমেলো ভাবে রহিয়াছে। খাবার জিনিষের উপর মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে।

—আর সেই সব পথে চলিয়াছে বিচিত্র পোষাক পরা নানা জাতির লোক। এখানে যেন পৃথিবীর সব জাতির মানুষের একটা মেলা বসিয়াছে। আরোহীসহ উটের

আরোহীসহ উটের দল থপ্ থপ্ করিয়া চলিতেছে

দল থপ্ থপ্ করিয়া চলিতেছে, গাধা, মহিষ, গরুর পালও পথ দিয়া যাইতেছে। ঘোড়ার পিঠে স্ত্রী-পুরুষ আরোহীও চলিয়াছে নিজেদের লক্ষ্য পথে। আকাশে ধূলা উড়িয়া ধূসর রঙের মেঘের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রচুর সূর্য্য কিরণে চারিদিক উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান।

সাহারার বুকে

সারা সহর ব্যাপিয়া কিসের যেন একটা সমারোহ চলিয়াছে। গলির ভিতরে মেয়েরা সূতা কাটিতেছে। পথের ধারে মূর শিক্ষক তাহার পড়ুয়াদের পাঠ দিতেছেন। ভারবাহী গাধা কোনদিকে না চাহিয়া প্রভুর আদেশ মানিয়া যাইতেছে। দীপ্ত সূর্য্যালোকে—কি প্রখরতা, কি সজীবতা! চারিদিকে জাগরণের সাড়া পড়িয়া আছে। এমনি এই ত্রিপলি বন্দর।

তুর্কী শাসনকর্ত্তার বাড়ীটি বেশ বড়। লাল রঙ্গ করা দরজা জানালা। বাড়ীর ধারে রাস্তার উপর ও সিংহদরজার ধারে ধূলি ও জঞ্জাল। পাশা বৃদ্ধ হইয়াছেন। বড় একটা বাড়ীর বাহির হন না।

অশোক ও দীপক কয়েকদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সহর দেখিল। মিঃ সার্প তাহাদিগকে এদেশের লোকজন সম্বন্ধে নানা কথা বলিতেন, নানা বিষয় সতর্ক করিয়া উপদেশ দিতেন। ত্রিপলির সীমায়ই যে ভীষণ সাহারা মরুভূমি সে কথা মনে করিয়া তাহাদের আনন্দ হইত। যে সাহারার কথা তাহারা ভূগোলে এবং নানা পুস্তকে পড়িয়াছে, আজ সেই সাহারার দেশে আসিয়া তাহাদের আনন্দ আর ধরে না। তাহাদের মনে পড়িল রবীন্দ্রনাথের কবিতা ঃ

> সুদুর্গম দূরদেশ,
> পথশূন্য তরু শূন্য প্রান্তর অশেষ,
> মহাপিপাসার রঙ্গভূমি, রৌদ্রালোকে
> জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে।
> দিগন্ত বিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা'পরে
> জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে পড়ে'
> তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস বহ্নিজ্বালাময়
> শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ নির্দ্দয়।

একদিন অশোকের ভাগ্যে একটা Adventure জুটিয়া গেল। অশোক একা সহরের পথে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। দীপক কাকার সেবার জন্য বাড়ীতে রহিয়াছে। অশোক বেড়াইতে বেড়াইতে ফলের বাজারের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। বাজারে নানা দেশের লোকজন দরদস্তুর করিয়া ফল কিনিতেছে বেচিতেছে। এমন সময় হঠাৎ দূর

হইতে লোকজনের হৈ রৈ চীৎকার ও হাহাকার শোনা গেল। ব্যাপারটা বড় সহজও নয়, পাগলা ঘোড়া ছুটিয়া আসিতেছিল,---সে দুই পাশের দোকানীদের জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চুরমার করিয়া ফলবিক্রেতাদের ফল নষ্ট করিয়া, সব জিনিষপত্র তছ্‌ নছ্‌ করিয়া বেগে ছুটিয়া আসিতেছিল। একটা তরমুজ—তাহার পিছনের ক্ষুরের ঘায়ে ফুটবলের মত আকাশে উঠিল। ঘোড়াটার এইরূপ উদ্দাম ছুটাছুটির দরুণ সারা সহরে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। একটি ছোট শিশু আপনার মনে পথের মধ্যে খেলিতেছিল---সে ত আর জানে না যে সম্মুখে ভীষণ বিপদ! ঘোড়াটা যখন তাহার কাছ হইতে মাত্র পনের কুড়ি হাত দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, ঘোড়ার ক্ষুরের ধূলায় চারিদিক অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে, এমন সঙ্কট মুহূর্ত্তে এমন কেহ কাছে নাই যে শিশুটিকে উদ্ধার করে, সুধু সকলে—উৎকণ্ঠার সহিত চীৎকার করিতেছিল। তাহাকে বাঁচাইবার জন্য কিন্তু কেহই কাছে আসিতে সাহসী হয় নাই। এমন সময় একজন অজানা পথিক কোথা হইতে আসিয়া তাহার গায়ের 'হাইক্' (পরিবার ঢিলা পোষাক) খানা ঘোড়ার মাথার উপর ফেলিয়া দিল। আকস্মিক ভাবে চোখ ঢাকা পড়ায় ঘোড়াটা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার গতি ফিরিয়া গেল। পাগলা ঘোড়াটা তাহার পিছনের পা দু'টো এমন ভীষণ ভাবে ছুড়িতে লাগিল যে সেই লোকটির কপালে পায়ের ক্ষুরের আঘাত লাগিল। সেই আঘাতে লোকটি তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল এবং তাহার মাথা ও কপাল গভীর ভাবে কাটিয়া যাওয়ায় সেখান হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত হইতে লাগিল। এই অবসরে শিশুটিকে তাহার আত্মীয়স্বজনেরা আসিয়া উদ্ধার করিয়া লইয়া গেল।

অশোক এই লোকটির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহস দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। সে তাহার রুমাল দিয়া সেই লোকটির আহত স্থানে পটি বাঁধিয়া দিল। লোকটি অবাক্ হইয়া অশোকের দিকে তাকাইয়া বলিল—ই-ঙ্গ-লি-জ --তুমি কে? অশোক বলিল---আমি বে-ঙ্গ-লী। লোকটা বে-ঙ্গা-লি, বে-ঙ্গা-লি বলিয়া দুই একবার অশোকের কথার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিল। তারপর হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া বলিল---সাহেব! সেলাম! অশোকও প্রতিনমস্কার করিয়া তাহার হাতখানি ধরিল। লোকটি এমন

জোরে অশোকের হাত নাড়িয়া দিল যে অশোকের মনে হইল যেন কব্জির হাড়গুলি পর্য্যন্ত চুরমার হইয়া যাইতেছে। খানিক পরে ঐ লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আঁকা-বাঁকা গলি-পথ দৃশ্য ধরিয়া অ হইয়া গেল।

অশোকের হাত নাড়িয়া দিল

এই ঘটনার পরের দিন দীপক বেড়াইয়া আসিয়া অশোককে কহিল—দাদা! জান কাল আমি এ সহরে একটা নূতন জিনিষ আবিষ্কার করেছি!

অশোক কহিল- কি সে জিনিষ?

রোম সম্রাট অরিলিয়াস্ (Aurelius) এর নির্ম্মিত তোরণ। এই তোরণের কথা অনেকের কাছেই শুনে-ছিলাম। দাদা, কি সুন্দর যে দেখ্‌তে, তা তোমায় আর বেশী কি বলবো।

কি করে দেখ্‌লে?

জান দাদা, পথে যেতে যেতে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল, সে আমাকে বল্লে —সাহেব, তুমি কি এই সহরে নূতন এসেছ? আমি বল্লেম—হাঁ। তখন সে বল্‌লে বেশত, চল তোমাকে আমি সহরটা দেখিয়ে আনি। তবে আমাকে কিছু বখ্‌শিশ দিতে হ'বে। আমার

কাছে দু' চারটে টাকা ছিল। কাজেই আর কোন অসুবিধে হ'ল না। নইলে মিঃ সার্পের কাছ থেকে ধার নিতে হত।

লোকটার কি নাম ভাই ?

হোসেন আলি। সে বল্লে যে সহরের সকলেই তাকে জানে। সে নাকি গাইড্।

পরের দিন অশোক যেমন পথে বাহির হইয়াছে, এমন সময় একটি লোক আসিয়া মাথা নোয়াইয়া তাহাকে সেলাম করিল। লোকটি দেখিতে খর্ব্বাকার ও শীর্ণ। নীল বর্ণের ঢিলে লম্বা জামা পরা; মাথার পাগড়ীটা তৈলসিক্ত, চোখ দুটি ছোট, কিন্তু দৃষ্টি খুবই তীক্ষ্ণ! অল্প অল্প দাড়ি আছে। অশোককে সে জিজ্ঞাসা করিল---Roman arch দেখবে ছোট সাহেব? আমি কে জান? Me Guide Hussein Ali!

অশোক হোসেন আলির সঙ্গে যাইয়া প্রাচীন রোমানদের তৈয়ারী তোরণের কারুকার্য্য ও গঠন-নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইল। কতকাল চলিয়া গিয়াছে, কত ঝড়ঝঞ্ঝা উহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, তবু স্থাপত্যকলার অপূর্ব্ব গৌরব স্বরূপ এই তোরণটি দাঁড়াইয়া আছে। রোমানদের কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে হোসেন-আলি একটা ছোট ঘরের কাঠের ভাঙ্গা দরজার তালা খুলিয়া বলিল এই ঘরটিতেই আমি থাকি।

সেই ঘরের পিছনেই সবজির বাজার। সেখানে লোকজনের গোলমাল হৈ চৈ চলিতেছিল!

এই ভাবে তাহাদের দিন যাইতেছিল, এমন সময় একদিন মিঃ সার্প বলিলেন—টিউনিস্ হইতে একখানি জাহাজ মাল্টা যাচ্ছে, তোমরা যদি ইচ্ছা কর, তবে সেই জাহাজে মাল্টা যেতে পার।

অশোক ও দীপক এই সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। কিন্তু তখনই তাহাদের মনে পড়িল, পীড়িত কাকার বেদনা-কাতর মুখখানির কথা। দুই ভাই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল---আমরা চলে গেলে আমাদের কাকাকে কে দেখ্‌বে?

মিঃ সার্প একথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অশোক ও দীপক বলিতে লাগিল—যে কাকা তাঁর প্রাণ দিয়ে আমাদের বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন তাঁকে এমন ভাবে

ফেলে আমরা কি ফিরে যেতে পারি? বাবা শুনলেই বা কি বলবেন। তবে মিঃ সার্পের যদি কোন অসুবিধা হয় সে হচ্ছে ভিন্ন কথা, তা না হলে কাকা সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা এখানেই থাকবো।

মিঃ সার্প বলিলেন,—তোমাদের যত দিন ইচ্ছা এখানে থাকতে পার। তোমর মেজর সেনের যোগ্য পুত্র! আমি তাঁর সন্ধান পেয়েছি। তিনি মাল্টাতেই আছেন, আমি কাল তাঁকে চিঠি লিখ্‌বো, তোমরা যদি ইচ্ছে কর, তবে আমার চিঠির সঙ্গে চিঠি দিতে পার।

তৃতীয় অধ্যায়

আফ্রিকার—মেলা

পরের দিন মাল্টাগামী জাহাজ আসিলে পর মিঃ সার্প অশোক ও দীপককে সহ সেই জাহাজে গেলেন। কাপ্তেন সেন একটু একটু করিয়া সুস্থ হইয়া আসিতেছিলেন এবং সেদিন বেশ তাঁহার সুনিদ্রাও হইয়াছিল।

জাহাজ ত্রিপলির বন্দর ছাড়িয়া ধোঁয়া উড়াইয়া ঢেউয়ের তালে তালে নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল। বাবাকে দেখিবার জন্য দুই ভাইয়ের মনের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিয়াছিল,—কিন্তু তাহারা বালক হইলেও কর্ত্তব্যের কাছে সেই ইচ্ছাটাকে দমন করিল। ফিরিবার পথে তাহাদের চোখের সম্মুখে ত্রিপলির দুর্গ স্পষ্ট ভাবে দেখা দিল। একটা পাহাড়ের গায়ে দুর্গটা রহিয়াছে। পাষাণে গড়া প্রাচীর অনেক যায়গায় ধসিয়া পড়িয়াছে। দিন নাই—রাত্রি নাই, সমুদ্রের তরঙ্গ আসিয়া তাহার পাষাণ-প্রাচীর-মূলে আঘাত করিতেছে। সমুদ্রের দিকে কোন কামান আর রাখা হয় নাই। প্রাচীরের গোড়ায় পাথরের পর পাথর জড় হইয়া রহিয়াছে। দুর্গের এখন এমনি দুরবস্থা যে একটি মাত্র কামানের ঘায়ে তাহা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যাইতে পারে।

তাহারা তিনজনে হাঁটিয়া বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিল। ত্রিপলির ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়ীর পথে তাহারা অগ্রসর হইল। সেই পথটুকুই যা একটু চওড়া। তারপর কোথাও দু'হাত, তিন হাতের বেশী চওড়া হইবে না। সেই ধূলি ও আবর্জ্জনাপূর্ণ পথ, সেই লোকজনের ভিড়, সেই হল্লা, সবই একঘেয়ে। ইউরোপীয়দের বাড়ী-ঘর সমুদ্রের পাড়ের দিকে উচু যায়গায়। দুর্গ-প্রাকার হইতে নামিবার পথে তিন চারিটি ভাঙ্গা সিঁড়ি পার হইলে পরই একটি পথ। পথটি অপ্রশস্ত।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। সমুদ্রের দিক্ হইতে শীতল বায়ু বহিয়া যাইতেছিল। ইউরোপীয় স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকারা পথে বেড়াইতেছিল। কিন্তু তাহাদের কথাবার্ত্তা ও চেহারা দেখিয়া মনে হইতেছিল যে তাহারা তেমন তৃপ্তির সঙ্গে সে দেশে বাস করিতেছিল না। তাহারা ক্রমশঃ বাড়ীর দিকে যাইতেছে, এমন সময় একজন যুবক তাড়াতাড়ি আসিয়া মিঃ সার্পের করমর্দ্দন করিল। তাহার গায়ে তুর্কী সৈন্যাধ্যক্ষের পোষাক। অশোক ও দীপক দেখিল যে এই ভদ্রলোক তাহাদের দিকে বেশ কৌতূহলি-দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। সার্প একটু নিম্নস্বরে ঐ কর্ম্মচারীর কাছে কি যেন বলিলেন, ইহাতে দুই ভাই আর একটু বিস্মিত হইল।

মিঃ সার্প বলিলেন—শোন অশোক ও দীপক! এই ভদ্রলোক আমার বিশেষ বন্ধু। ইহার নাম ওস্‌মান বেগ। ইনি কাল তোমাদের তুর্কী শিবির দেখ্‌বার জন্য নিমন্ত্রণ করছেন। অশোক ও দীপকের মনে হইতেছিল তাহাদের কাকার কথা! কাকাকে ফেলিয়া কি করিয়া তাহারা আসিতে পারে! ব্রিটিশ রাজদূত তাহাদের চাহনি দেখিয়াই উহার অর্থটা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি হাসিয়া বলিলেন—"কাল ডাক্তার আস্‌বেন, তিনি অনেকটা সময় রোগীর কাছে থাকবেন, সে সময়ে তোমরা তুর্কী-শিবির দেখে ফিরে আস্‌তে পারবে। বেশী দূরে ত নয়, সহরের কাছাকাছি। তোমাদের পথ চিনিয়ে নেবার লোকেরও অভাব হবে না। পথ চিনিয়ে নেবার লোকের কথায় মিঃ সার্প যে হোসেন আলির কথাই বলিতেছেন, সে নিঃসন্দেহ।

পরের দিন হোসেন আলি খুব সকালে ব্রিটিশ রাজদূতের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অশোক ও দীপককে লইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ত্রিপলি সহরের বড় দরজা

পার হইয়া—একেবারে সহরের বাহিরে আসিয়া পড়িল। একটি বালুময় পাহাড়ের উপর তুর্কীদের শিবির।

এই শিবির দেখিবার মত বটে। চারিদিকে মাটির দেয়াল ঘেরা। সেই দেয়ালের ভিতরে তুর্কী সৈনিকদের সারি সারি তাঁবু পড়িয়াছে। একদিকে সৈনিকদের শিবির। মাঝখানে সুন্দর পথ। বন্দুকগুলি স্তরে স্তরে সাজান। অফিসারদের থাকিবার শিবিরগুলি অল্প দূরে দূরে অবস্থিত। সেই সব শিবিরের পাশে ছোট ছোট ফুলের বাগান তৈরী করা হইয়াছে। সৈনিকদের কাপড় চোপড়গুলি বাতাসে দোলাদুলি করিতেছে। চারিদিক দিয়া ঘেরাও করা ইদারা হইতে কেহ কেহ জল তুলিতেছে। আফ্রিকার নীরস ভূমিতে জলের যে কত প্রয়োজন তাহা এই শিবিরের এই ইদারার ব্যবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। আর একদিকে বসিয়া কয়েকজন সৈনিক তাহাদের রাইফেল (Rifles) পরিষ্কার করিতেছিল। অনেকগুলি লোক ছালাভর্ত্তি ময়দা বহিয়া বহিয়া রন্ধনশালার পাশের ভাঁড়ারে লইয়া যাইতেছিল। চারিদিক দিয়াই লোকগুলির মধ্যে একটা সজীবতা ও প্রাণের সাড়া দেখা যাইতেছিল। কোথাও তুর্কী সৈনিকেরা বন্দুক ও সঙ্গীন কাঁধে করিয়া কুচকাওয়াজ করিতেছিল। রৌদ্রালোকে তীক্ষ্ণ সঙ্গীন্‌গুলি ঝক্ মক্ করিতেছিল।

—তুর্কী শিবিরের সাজসজ্জা, নিপুণতা এবং তুর্কী সৈন্যাধ্যক্ষের ভদ্রতা ও সৌজন্য দেখিয়া অশোক ও দীপক মুগ্ধ হইয়াছিল। হোসেন আলি কিন্তু তুর্কী-শিবিরে আসিয়া কেমন যেন ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল।—সে অশোক ও দীপককে কেবলি বলিতেছিল —চল ফিরে যাই। তুর্কীদের শিবিরটা বড় সুবিধের নয়। আমি গেটের বাইরে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবো সাহেব এ কথা কয়টি বলিয়া সে অতি দ্রুত চম্পট দিল।

তাহারা দুইজনে অশোক ও দীপক একরূপ নিঃসঙ্গ অবস্থায় চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া সবটা দেখিয়া শুনিয়া যেমন গেটের বাহির হইবে, এমন সময় একজন দীর্ঘাকার সৈনিক, সৈনিকি-কায়দায় (Military-salute) অভিবাদন করিয়া তাহাদিগকে একটি বড় সুসজ্জিত শিবিরের ভিতর লইয়া গেল, সেখানে অশোক ও দীপকের পরিচিত তুর্কী-

সৈন্যাধ্যক্ষ ওসমান্ বেগ বসিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের দুই ভাইকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন।

—তিনজনে একসঙ্গে এক টেবিলে বসিয়া খাওয়া দাওয়া শেষ করিবার পর ওসমান্ বেগ পরিষ্কার ইংরাজী ভাষায় বলিলেন—আমি জানি তোমরা বিদেশীরা নূতন অজানা দেশের প্রাচীন কীর্ত্তি ও ধ্বংসাবশেষ দেখ্‌তে ভালবাস।

অশোক ও দীপক তাহার এ কথার আর কোন উত্তর দিল না। ওসমান্ বেগ তাহার টেবিলের উপর হইতে একটি এলবাম্ বাহির করিয়া তাহাদের সম্মুখে ধরিল। সেই এলবামের ভিতর অনেকগুলি ফোটোগ্রাফ ছিল। ওসমান্ বেগ একে একে তাহাদের সেই ফোটোগ্রাফগুলি দেখাইতে লাগিলেন। চমৎকার সেই আলোকচিত্রগুলি। সেগুলির বেশীর ভাগই সাহারা মরুভূমির দৃশ্য। কোথাও সাহারার বুকের পাহাড়, কোথাও খর্জ্জুরকুঞ্জ, কোথাও হ্রদ, কোথাও উচ্চ গিরিশৃঙ্গ, কোথাও ভাঙ্গাচূরা মন্দির, কোথাও স্মৃতিস্তম্ভ। সব ছবিগুলির পশ্চাৎ দৃশ্য অসীম অনন্ত বালুকাময় ভীষণ সাহারা মরুভূমি।

এল্‌বাম বাহির করিয়া চিত্র দেখাইতে লাগিল

দীপক জিজ্ঞাসা করিল—এই ছবিগুলি কি আপনি নিজে তুলেছেন?

হাঁ—অনেকগুলি আমি নিজেই তুলেছি। তবে সবগুলি নয়। এই ছবিখানা আমার একজন বন্ধু তুলেছেন। আর এই ছবি তুলতে গিয়ে তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছিল।

অশোক ও দীপক একান্ত আগ্রহের সঙ্গে এই নূতন ছবিখানা দেখিতে লাগিল। ছবিটি তেমন কিছুই নয়। একটা ভাঙ্গা পুরাণো বাড়ী, ঘোড়ার ক্ষুরের মত বাঁকানো তার গঠন, বাড়ীটার একটা দিক্ একেবারে ধসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বাড়ীর থামগুলি আর বাঁকান খিলানগুলি ঠিক্ খাড়া আছে। দেখিলে মনে হয় এক সময়ে এই বাড়ী হয়ত বা একটা মঠ ছিল। বাড়ীর একদিক্ হইতে এক সার সিঁড়ি জঙ্গলের দিকে নামিয়া আসিয়াছে। সেখানটায় মাথা সমান উচু নানা ঘাস ও জঙ্গল। তারই পাশে ছোট একটা পাথরের তৈরী চৌবাচ্চা। সেখানকার কালো জলের মধ্যে বাড়ীটার একদিক্কার ছবি প্রতিফলিত। এই পোড়ো বাড়ীর পশ্চাতে ঝোপ-ঝাড় ও জঙ্গল। কয়েকটি খেজুর গাছ—তারপর দিগন্ত বিস্তৃত সাহারার ধূ-ধূ-ধূ বালুকাময় প্রান্তর।

এই চিত্রটি দেখিলেই একটা ভীষণ নির্জ্জনতার ছবি চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। সামনে একটা হরিণের কঙ্কাল পড়িয়া আছে ও আরও কতকগুলি হাড় এদিকে ওদিকে পড়িয়া রহিয়াছে।

অশোক চমকিত হইয়া বলিল- আপনার বন্ধু যে এমন দুর্গম যায়গা থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আস্তে পেরেছেন, এ তার সৌভাগ্য বলতে হ'বে। না জানি কত হাজার হাজার সিংহ সেখানে গর্জ্জন করে বেড়াচ্ছে।

ওস্মান বেগ বলিলেন- সিংহ আছে নিশ্চয়ই, তবে কি জান ওখানটা হচ্চে মরুভূমির চোর ডাকাতের আর তুরেগ দস্যুদের মস্ত বড় আড্ডা।

দীপক বলিল --ঐখানে কি ত্রিপলি হ'তে যাওয়া যেতে পারে?

ওস্মান বেগ হাসিয়া বলিলেন--আমি কিন্তু সেখানে যেতে বলবো না! যদি সেখানে যাও, তা হ'লে আর ফিরে আস্তে হবে না।--এই ভাবে নানা কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া তাহাদের তুর্কীদের সৈন্যাবাস দেখা শেষ হইয়া গেল।

অশোক ও দীপক যখন তুর্কী-শিবির হইতে বাহিরে আসিল, তখন দেখিতে পাইল তাহাদের 'গাইড' হোসেন আলি একটা পাথরের সিঁড়ির উপর হেলান দিয়া বসিয়া আছে। তাহারা দুইজনে সারাপথে কেবল—ওস্মান বেগের কাছে যে ছবি দেখিয়াছিল, সেই ছবির কথাই বলিতেছিল। দুর্গম সাহারার বালুকাময় ভীষণ প্রান্তর যেন তাহাদিগকে কেবলি

আহ্বান করিতেছিল—এস এস তোমরা আমার বালুকাময় তপ্ত বুকে। ত্রিপলি আসিবার পর হইতে অশোক ও দীপক একদিনের জন্যও ভোলে নাই যে তাহারা সাহারা মরুভূমির প্রান্তদেশে বাস করিতেছে। কতদিন তাহারা মিঃ সার্পের প্রশস্ত বাড়ীর ছাদের উপর দাঁড়াইয়া বিশাল মরুময়-প্রান্তরের ভীষণ দৃশ্য দেখিয়াছে। হোসেন আলি বুঝিতে পারিয়াছিল যে এই বালক দুইটির মনের মধ্যে সাহারার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িবার বেশ একটা ইচ্ছা আছে, তখন সে আকস্মিক ভাবে বলিয়া উঠিল—সাহেব, —বুঝ্‌তে পাচ্ছো,—মরুভূমির ভিতরে যে সব দেখ্‌বার জিনিষ আছে সে অনেক অনেক দূর! তবে তোমরা যদি মরুভূমির কাছাকাছি কোন ধ্বংসাবশেষ দেখ্‌তে চাও, তা আমি দেখিয়ে আন্‌তে পারি। তাহারা দুই ভাই হোসেন আলির কথা শুনিয়া মনে মনে বিশেষ আনন্দিত হইল।

এদিকে কাপ্তেন সেন ভাল হইবার দিকে আসিতেছিলেন। একদিন ডাক্তার সাহেব তাহাকে দেখিয়া বলিলেন এখন রোগীর জীবনের আর কোনও শঙ্কা নাই, তবে এখন তাঁর শুশ্রূষাটা যদি আরও ভাল হয় এবং চুপ্‌ চাপ্‌ থাক্‌তে পারেন, তবে অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থ সবল হ'য়ে উঠ্‌বেন।

একদিন মিঃ সার্প বলিলেন—আবার একটা জাহাজ এ পথেই মাল্টা যাবে, তোমরা কাকাকে নিয়ে সে জাহাজটাতে অনায়াসেই ফিরে যেতে পারবে।

কয়েকদিন পরে অশোক ও দীপককে মিঃ সার্প পুনরায় ডাকিয়া বলিলেন,—পরশু দিন মাল্টার জাহাজ আস্‌ছে। তোমাদের কাকাও ত অনেকটা ভাল হয়েছেন, তোমরা যদি ইচ্ছা কর তা হ'লে কাল আফ্রিকার একটা মস্ত বড় মেলা দেখে যেতে পার।

অশোক ও দীপক পরম উৎসাহিত হইয়া তাঁহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। মিঃ সার্প পরম উৎসাহের সহিত বলিলেন—এখান হ'তে আট দশ মাইল দূরে একটা গ্রামে একটা মেলা বস্‌বে। কোন একটা সরকারি কাজের জন্য আমার সেক্রেটারীকে সেখানে পাঠাব, তোমরা তাঁর সঙ্গে সে মেলায় যেতে পারো।

অশোক ও দীপকের খুবই আনন্দ হইল। তাহারা যাহা চাহিতেছিল, অবশেষে কিনা তাহাই মিলিয়া গেল! তবে তাহারা সত্য সত্যই আফ্রিকার একটা মেলা দেখিতে পারিবে। সেদিন দুই ভাই সর্ব্বক্ষণ মেলায় যাইবার আনন্দে অধীর হইয়া রহিল।

কথাটা কিন্তু Mc - guide—Hussein Alir অজানা রহিল না। সে অশোক ও দীপকের সঙ্গে দেখা করিয়া কহিল—Masters—সেই যে ruin টার কথা বলেছিলাম, মেলার কাছ হ'তে সে যায়গাটা বেশী দূরে হ'বে না। সেখানে সোয়ারী গাধা পাওয়া যায়, গাধার পিঠে চড়ে সেই ধ্বংসাবশেষ দেখে অনায়াসেই বেলাবেলি মেলাতে ফিরে এসে—সেক্রেটারীর সঙ্গে আবার সহরে আসা যাবে।

মিঃ সার্প যখন হোসেন আলির মরুভূমি দেখিতে যাইবার প্রস্তাবের বিষয় জানিতে পারিলেন, তখন একটু গম্ভীর হইয়া গেলেন, তাঁহার কাছে মরুভূমির দিকে বেড়াইতে যাওয়াটা তেমন সঙ্গত বলিয়া মনে হইল না।

তিনি অশোক ও দীপককে বলিলেন দেখ, আমি হোসেন আলিকে এখানে এসে অবধিই জানি, লোকটাকে মন্দ বলে মনে হয় না। তবে কি জান, এদেশের এই লোকগুলোর টাকার বড় খাক্তি। এরা টাকার জন্য না করতে পারে এমন কোন কাজ নেই। তারপর এ মেলায় আফ্রিকার নানা দেশ থেকে লোক আস্‌বে। মরুভূমির বাসিন্দারা ভয়ানক দুর্দ্দান্ত, তারা চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি করতে এতটুকু ভয় পায় না। তোমরা মেলায় যাও সে বেশ কথা, কিন্তু সাবধান! মিষ্টার স্মার্ট (সেক্রেটারী) যেমন যেমন বলেন, ঠিক্ সেই ভাবে চলো।

হোসেন আলির কানে মিঃ সার্পের এই মন্তব্যগুলি পৌছিতে বেশী দেরী হইল না—সে হাসিয়া বলিল—Masters! বুঝলুম! মানে সে দেখে নোব।

মিঃ সার্পের কথায় অশোক ও দীপকের মন ক্ষণকালের জন্য মাত্র একটু দমিয়া গিয়াছিল, তারপর আবার তাহারা বেশ প্রফুল্ল মনে পরদিন মেলা দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

কাপ্তেন সেন সবল হইয়া উঠিতেছিলেন। এখন তিনি ঘরের ভিতরই একটু একটু চলা ফেরা করিতে পারেন। তাঁহার এই সবল ও প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া দীপক ও অশোক

দুইজনে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। একদিন--আর একটি দিন পরেই ত তাহারা মাস্টার জাহাজে সাগরের বুকে পাড়ি জমাইবে।

---একদিন--সেই একদিন! আমরা জানি এমনই একটি দিনের মধ্যেই না পৃথিবীর বুকে কতদিকে কত ঘটনায় কত না বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা রূপকথায় পড়িয়াছ --যে পরিরাণীর কথা না শুনিয়া রাজপুত্র যেমন নিষিদ্ধ কক্ষের দরজা খুলিলেন--তখনি কোথা হইতে একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া আসিয়া তাহাকে ভীষণ মরুপ্রান্তরে ফেলিয়া আসিল। এমনি ভাবে -একটি দিন একটি মুহূর্তেও ত অনেক কিছু বিপদ ঘটিতে পারে! অশোক ও দীপকই বা কেমন করিয়া জানিবে, বিধাতা তাহাদের অদৃষ্টে কি লিখিয়া রাখিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বিপদের—মুখে

মেলা দেখিবার উৎসাহ ও আনন্দ অশোক ও দীপককে এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছিল---যে সারারাত্রি তাহারা ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারে নাই। কেবলি ভাবিয়াছে, কখন রাত্রি ভোর হইবে, কখন তাহারা রওয়ানা হইবে! সূর্য্য উঠিবার অনেক আগেই তাহারা ঘুম হইতে জাগিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। মিঃ স্মার্ট বলিয়াছিলেন যে --সূর্য্য উঠবার আগেই রওয়ানা হ'তে হবে।

অশোক ও দীপক দুইজনে পথের ধারে বারান্দার কাছে দুইখানি চেয়ারে বসিয়া সহিসের অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদের জন্য দুইটি ভাল ঘোড়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এদিকে মিঃ স্মার্ট, অশোক ও দীপকের চেয়ে ব্যস্তবাগীশ বড় কম নন, তিনিও ব্যস্তভাবে বারান্দায় পাইচারী করিতেছিলেন। তখনও সূর্য্য ভাল করিয়া পূব আকাশে ফোটে

নাই, সুধু গোলাপী রেখা মাত্র প্রতিভাত হইয়াছিল। এদিকে কোচোয়ান তিনটি ঘোড়াকে সাজ পরাইয়া আনিয়াছে, ঠিক্ সেই সময়েই একজন তুর্কী সৈনিক খুব বড় একটা খাম লইয়া আসিল এবং একজন দেশীয় ভৃত্যের হাতে খামটি দিয়া আবার খট্ খটা খট্ শব্দে রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

ভৃত্য অশোকের হাতে সেই ভারি লেফাফাটা দিয়া চলিয়া গেল। খামের উপরে ছিল ফরাসী ভাষায় তাহারই নাম লেখা। সেই মুহূর্ত্তেই খামটা খুলিয়া দেখিবার জন্য তাহার খুবই ঔৎসুক্য হইয়াছিল, কিন্তু মিঃ স্মার্ট যেমন তাড়াহুড়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন, তারপর তুর্কী সৈনিকটাও চিঠিখানা দিয়াই চলিয়া গেল,—তাহাতে বুঝা গেল যে যিনি এই চিঠিখানা পাঠাইয়াছেন, তাঁহার উত্তরের জন্য তেমন কোন তাড়া নাই কাজেই সে তাড়াতাড়ি পকেটের মধ্যে চিঠিটা পুরিয়া রাখিল এবং দুই ভাই মিলিয়া দুইটি তেজস্বী ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল।

সুন্দর নির্ম্মল প্রভাত। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। সহরের পথ দিয়া যাইবার সময় মিঃ স্মার্ট অশোক ও দীপকের কাছে এই সহরের সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া যাইতে-ছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, গরমের দিনে এখানকার লোকেরা ঘরের ছাদে শুয়ে ঘুমায়। সারা গায়ে তাদের ঢিলা জামা জড়ান থাকে। আমি যখন প্রথম এ দেশে এসেছিলাম, তখন ভোরের বেলা এইসব ঘুমন্ত লোকগুলি যখন জেগে উঠ্‌ত, তখন মনে হ'ত যে এরা যেন সব কবর থেকে উঠে এল। এমনি তাদের শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেখাত।

সহরের গলিঘুঁজি, এ পাড়া ও পাড়া পার হইয়া তাহারা সহরের দক্ষিণ দিক্‌কার দরজা দিয়া সহরের বাহিরে আসিল। এদিক্‌কার পথটা তেমন ভাল নয়। উচুনীচু আর আঁকা-বাঁকা, কাজেই ঘোড়সোয়ারদের এ পথটা একটু আস্তে আস্তে যাইতে হইল। এই সুযোগে অশোক তাহার পকেট হইতে লেফাফাটা বাহির করিয়া খুলিল। সে লেফাফাটা খুলিয়াই দীপকের দিকে চাহিয়া বলিল —দেখেছ দীপক!—ওস্‌মান বেগ— সেই যে মরুভূমির ফটোখানা, যে খানা দেখে আমরা খুব চমৎকৃত হয়েছিলাম; সেই ছবিখানা আমাদের দু'জনকে উপহার দিয়েছেন! সেই মরুভূমির বুকের ধ্বংসাবশেষ, সেই সেখানকার ঝরণা! কি মজা! চমৎকার লোক এই ওস্‌মান বেগ!

যে গ্রামে মেলা বসিয়াছে সেই গ্রামের নাম হইতেছে হেম্মৎ-এল-জাগ্লা। গ্রামখানি খুবই ছোট। এখানকার বাড়ীগুলি চৌ-কোণবিশিষ্ট। একটি মাত্র ছোট দরজা। কোন জানালা নাই। ঘরের ভিতরে একদিকে ছাগল, একদিকে ভাঁড়ারের জিনিষপত্র, একদিকে তামাক-পাতার রাশ! আলো নাই, বাতাস নাই--অন্ধকারাচ্ছন্ন অদ্ভুত এই ঘর-গুলি। কেমন করিয়া যে মানুষ এমন অন্ধকার ঘরে বাস করে তাহা ভাবিবার বিষয় বটে! এখানকার লোকেরা তোমাকে নিমন্ত্রণ করিলে খাওয়াইবে খেজুর, শুক্‌নো রুটি, এক পেয়ালা কফি, আর কিছু মাংস। বিদেশী লোককে তাহারা বড় একটা ভাল চোখে দেখে না।

মেলার পথে গ্রাম

অশোক ও দীপকের কাছে সবই লাগিতেছিল নূতন, সবই যেন বিচিত্র! ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরগুলি শুক্‌নো ঘাসে ছাওয়া, অনেকটা দেখিতে পাখীর বাসার মত। আর দূরে ঘন জঙ্গলের মাথার উপর দিয়া দেখা যাইতেছিল,—একটা লাল বাড়ী বোধ হয় এক সময়ে মূরেরা ইহা তৈরী করিয়াছিল। পথ দিয়া উটের সারি চলিতেছিল। কঁ্যাকর-কো-কঁ্যাকর-কো করিতে করিতে গরুর গাড়ী ধূলি উড়াইয়া যাইতেছিল--এই গাড়ীগুলির চাকা সেই কোন্ সত্যিকালকার তৈরী।

কোন কোন যায়গায় দেখা গেল ছোট ছোট নীচু ঢালু যায়গার চারিদিকে বেশ

উচু মাটির প্রাচীর দিয়া ঘেরা—এইখানে বৃষ্টির জল সঞ্চিত করিয়া রাখে। এই সঞ্চিত জল হইতেই এখানকার চাষারা তাহাদের ক্ষেতে জল দেয়।

এই ভাবে আট মাইল পথ চলিয়া তাহারা মেলার কাছে আসিয়া পৌঁছিল। অদ্ভুত এই মেলা। আফ্রিকার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম নানা অঞ্চল হইতে এখানে সব

কালাহারি মরুভূমির মানুষ

লোক আসিয়া জড় হইয়াছে। এমন সব দেশের লোক এ মেলায় আসিয়াছে—যে সব দেশে সভ্যদেশের মানুষ কোন দিন পদার্পণও করে নাই। কোথায় কালাহারি মরুভূমির দেশের লোক, মাথায় তার উট পাখীর ডিমের তৈরী অদ্ভুত মালা, কোথায় বুশ্‌ম্যান, তাদের তীর ধনুক লইয়া মেলার এক পাশের একটা ঝোপের পাশে বসিয়া কোন্

একটা দূরের শিকার লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িতেছে। কোথায় সাহারার সেই একপ্রান্ত হইতে আসিয়াছে নিগ্রোর দল। একটা নিগ্রো, মেলার মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে।

একটা দূরের শিকার লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িতেছে

তাহার একটা চক্ষু কানা, মাথায় পশমের মত চুল, সারা গায়ে একটা কাপড় জড়ানো, মরুভূমির ধূলা তাহার চুলগুলি একেবারে ধূসর করিয়া দিয়াছে। কতকগুলি কালাহারি মরুভূমির মেয়ে উটপাখীর ডিমের খোলায় পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছে রান্নাবান্নার ও পানের জন্য। কিকিউ জাতীর মেয়েরা আসিয়াছে দলে দলে মেলা হইতে সওদা করিয়া লইবার জন্য। দামারার মেয়েদের মাথার অদ্ভুত রকমের সজ্জা দেখিয়া অশোক ও দীপক দুইজনে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। একটা দীর্ঘাকার তুরেগ--সেকেলে ধরণের লম্বা বন্দুক কাঁধে করিয়া মেলার দিকে যাইতেছে। উত্তর মরক্কো দেশের একজন সম্ভ্রান্ত লোককে দেখা গেল,—তাঁহার মাথায় মস্ত বড় পাগড়ী, গায়ে দামী রেশমী পোষাক, শণের মত সাদা লম্বা দাড়ী বুক পর্য্যন্ত ঝুলিতেছিল। তাঁহার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, গতি

বিজ্ঞের মত। তিনিও উৎসুকভাবে মেলার এদিক্ ওদিক্ বেড়াইয়া দেখিতেছিলেন। মেলার একদিকে সেজ্ জান অঞ্চলের লম্বা ও শক্ত ঘাসের ছাউনী ও মাদুর তৈরী করিবার ঘাস প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইয়াছে। বর্ণু অঞ্চলের লোকেরা সব লম্বা লম্বা হাতীর দাঁত বেঁচিতে আনিয়াছে। একজন মুরসর্দ্দার তিম্বাক্তু হইতে হস্তীদন্তের ও রূপার কাজ করা একটা বন্দুক কিনিয়া এই মেলার পথে নাইজার নদীর দেশে ফিরিয়া যাইতেছে।

একটা নিগ্রো মেলার মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে

একদিকে কতকগুলি বড় বড় ন্যাকড়ার পুঁট্লি, এইগুলি কাগজ তৈরীর জন্য জাহাজে করিয়া ইংল্যাণ্ডে যাইবে। মেলার কোথাও কতকগুলি দূর মরুভূমির দেশের লোক আসিয়াছে অষ্ট্রিচ্ পাখীর পালক বেঁচিবার জন্য। ত্রিপলির পথে ইউরোপ ও আমেরিকাতে প্রচুর পরিমাণে উট পাখীর পালক চালান দেওয়া হয়। ইউরোপের বিলাসিনী মহিলারা সেই পাখীর পালক দিয়া শিরোভূষা করেন। কোন একস্থানে ফলের বাজার বসিয়াছে —সেখানে কমলা, তরমুজ, আলুবোখ্রা, খুবানী, ডালিম, লাউ -কুমড়া—মেশিয়া দেশের সুজলা ও সুফলা দেশ হইতে বিক্রয়ের জন্য প্রচুর পরিমাণে আসিয়াছিল। অশোক ও দীপকের কাছে এই মেলার লোকগুলির অজানা ভাষা, অদ্ভুত রকমের জিনিষ-পত্রের বেঁচা-কেনা নূতনতর ঠেকিতেছিল। ঐ যে মরুভূমি চলিয়া গিয়াছে, যোজনের পর যোজন বিস্তৃত ! সেই মরুভূমির দেশ হইতে প্রখর সূর্য্যকিরণে তপ্ত হইয়া কেমন করিয়া ইহারা আসিল। কেমন সেই মরুভূমির দেশ ! কেমন করিয়া

উট পাখীর ডিমের খোলায় করিয়া পানীয় জল সংগ্রহ করিতেছে

বর্ণু অঞ্চলের লোকেরা হাতীর দাত বেচিতে আসিয়াছে

সে দেশের পুরুষ ও মেয়েরা খায় দায় চলা ফেরা করে! এ সকল জানিবার জন্য অশোক ও দীপকের মনে একটা কৌতূহল এখানে আসিয়া যেমন হইয়াছিল, এইবার প্রত্যক্ষ ভাবে তাহাদের দেখিয়া সেই কৌতূহল আরও অনেক বাড়িয়া গেল।

লাউ কুমড়া বেচিতেছে

অশোক গম্ভীর ভাবে কহিল— ভাই দীপক, বাবা যদি মাল্টাতে আমাদের জন্য অপেক্ষা না করতেন, তাহলে আমি এই মরুভূমির দেশের লোকদের সঙ্গে সাহারাটা বেড়িয়ে আস্‌তেম।

দীপক কহিল —ঠিক্ কথা দাদা! হয়ত একদিন আমাদের সাহারা বেড়াবার সাধ পূর্ণ হবে। তবে এখন চল, বাবার কাছে মাল্টা যাই।

এমন সময় তাহারা দেখিতে পাইল যে মেলার এক কোণে দুইজন লোক দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে। একটি লোক বেঁটে আর একটি বেশ দীর্ঘাকার এবং বলিষ্ঠ। তাহাদের মধ্যে কি কথা হইতেছিল, অশোক ও দীপক তাহা জানিতে পারে নাই। বেঁটে লোকটিকে তাহাদের পরিচিত হোসেন আলি বলিয়া মনে হইল। যেমন তাহারা উহাদের কাছাকাছি গেল, অমনি সেই বেঁটে লোকটি হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

অশোক, দীপককে বলিল—আমার মনে হয়েছিল ঐ বেঁটে লোকটা বোধ হয় হোসেন আলি হবে, কিন্তু কখ্‌খনো সে নয়, সে হ'লে আমাদের দেখে কখনো চলে যেত না, নিশ্চয়ই দু'একটা কথা বল্‌ত।

একে একে তাহারা মেলার এদিক্ ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল। সূর্য্যের তেজ বেশ প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। প্রখর সূর্য্যালোকে বালুগুলি হীরা মণির মত জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছিল। উষ্ণ বায়ু এমন বেগে বহিতেছিল যে তাহাদের মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল যেন সারাটা শরীর পুড়িয়া যাইতেছে। মিঃ স্মার্ট তাহাদের ক্লান্তির ভাবটা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন মেলার একটু দূরে গ্রামের মধ্যে আমার পরিচিত একজন মূর ভদ্রলোক আছেন, চল তাঁর বাড়ীতে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করা যাক্।

একটা উঁচু পথ ধরিয়া তাহারা তিন জনে বালুর ঢেউ উড়াইয়া যাইতে লাগিল। খানিক পথ চলার পর তাহারা একটা প্রকাণ্ড প্রাচীর ঘেরা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাড়ীটি বেশ বড়। সদর দরজা পার হইলেই দীর্ঘ তরু-বীথি। তরুশ্রেণী শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া চারিদিক্টা ছায়া-শীতল করিয়া রাখিয়াছে। বাহিরের কোলাহল, ধূলি ও রৌদ্র এখানে প্রবেশ করিতে পারে নাই। বাগানটি অতি সুন্দর—সাহারার ধারে হইলেও পুষ্পিত ও সজ্জিত। প্রাচীরের কিনারায় কিনারায় খেজুর গাছের সারি। দেউড়ীর কাছে ঘোড়া হইতে নামিয়া একটি সুন্দর ঘরের কাছে যাইয়া মিঃ স্মার্ট পায়ের জুতা খুলিয়া দরজার একপাশে রাখিলেন,

দামরো দেশের মেয়ে—মাথায় চামড়ার তৈরী মুকুট

বালকেরাও তাহার অনুকরণ করিল। দরজার কাছে আসিবামাত্র একজন কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস একটা মোটা পরদা সরাইয়া ফেলিল। সেখানে সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে একজন বৃদ্ধ মূর বসিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের তিন জনকে পরম সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। মূর ভদ্রলোকটি দেখিতে বেশ সুশ্রী। তাহার দাড়িগুলি সব

মেলায় নানাদেশের লোক

পাকিয়া গিয়াছে। পরস্পরের আদর-আপ্যায়ন ও অভিবাদনের পর---চারিজনে ঘরের মেজেতে উপবেশন করিলেন। মেজেটিতে পারস্য দেশীয় মূল্যবান্ গালিচা পাতা। গালিচার উপর ঘরের এ কোণে ও কোণে সব, গদির মত মোড়া রহিয়াছে। মাঝখানে একটি ছোট টেব্‌ল। টেবিলের উপর একটি বড় রকমের রেকাবী। তাহার মধ্যে সুগন্ধি চালের ভাত। মাংস, মনক্কা, কলা এই সব ফল-ফলারি রহিয়াছে। তাহারা চারিজনে ঐ বড় রেকাবিটা হইতে হাত দিয়া একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করিলেন, তারপর মূর ভদ্রলোকটি যেমন হাততালি দিলেন, অমনি একজন লম্বা কালো রকমের আফ্রিকার ভৃত্য -ছোট ছোট রূপার বাটিতে করিয়া কফি ও চীনামাটির রেকাবীতে করিয়া হালুয়া আনিয়া দিল।

খাওয়ার সময় মিঃ স্মার্টের সহিত মূর ভদ্রলোকের আরব্যভাষায় অনেক কিছু

কথাবার্তা হইতেছিল,—অশোক ও দীপক তাহার এক বর্ণও বুঝাতে পারে নাই। আফ্রিকা দেশের মূর অধিবাসীদের গৃহে অশোক ও দীপক ত পূর্ব্বে আর কখনও আসে নাই কাজেই এই মূর ভদ্রলোকের বাড়ি-ঘর, আস্‌বাবপত্র সমুদয়ই নূতন নূতন লাগিতেছিল। ঘরের মধ্যে বেশী কিছু অবান্তর রকমের জিনিষপত্র ছিল না। বেশীর ভাগই নানা শ্রেণীর সুন্দর সুন্দর গালিচা। তাহাদের মাথার উপরে রূপার বাতি ও ঝাড় লণ্ঠন ঝুলিতেছিল। দেয়ালের গা নানা রংয়ে চিত্রিত। ঘরের ভিতরটা বেশ সুরভিত। সেই ভদ্রলোকটির সহিত পুনর্বার ভদ্রতা ও সৌজন্যপূর্ণ আদব-আপ্যায়ন ও নমস্কার প্রতিনমস্কারের পর মিঃ স্মার্ট বৃদ্ধের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অশোক ও দীপককে লইয়া বাহিরে আসিলেন।

মূর ভদ্রলোকটি দেখিতে বেশ

মিঃ স্মার্ট, অশোক ও দীপককে সঙ্গে করিয়া তাহাদের জুতা পরিয়া দেউড়ীর দিকে চলিতে লাগিলেন। পথে স্মার্ট বলিলেন—আমার এ গ্রামে আরও কিছু কাজ করিবার আছে। আমি হাসান সাহেবকে (বৃদ্ধের নাম) বলেছি,— আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তোমরা তাঁর বাড়ীর বাগানের ভিতর খেলা-ধূলো করবে। কিন্তু সাবধান ! আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত কোথাও যেয়োনা যেন ! আমি বেলাবেলিই ফিরে আসছি তারপর ত্রিপলি ফিরে যাবো। তোমাদের এখানে কোন ভয় নেই, বেশ মনের আনন্দে বেড়াতে পারবে। এইরূপ বলিয়া মিঃ স্মার্ট চলিয়া গেলেন।

—নির্দ্দিষ্ট সময়ের অল্প একটু পরেই তিনি ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু অশোক ও দীপককে বাগানের কোথাও পাওয়া গেল না। মিঃ স্মার্ট উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথা হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তবে তাহারা কোথায় গেল ? তিনি মনে মনে একটু বিরক্ত হইলেন, কেমন অবাধ্য

এই ছেলে দু'টি ! তাহার কথা না শুনিয়া তবে কোথায় চলিয়া গেল ! —শেষটায় প্রকৃত ব্যাপারটা জানিবার জন্য বৃদ্ধ হাসান সাহেব ও তাঁহার ভৃত্যদের নিকট সংবাদ লইয়া জানিলেন যে তাঁহারাও অশোক ও দীপকের কোনও সন্ধান জানে না, তখন তিনি একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

বাগানের দরজার কাছে যে ক্রীতদাসটা পাহারা দিতেছিল,—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সেও বলিল যে—বালক দুইটি তাহার নজরে পড়ে নাই। তাহার নজরে যে পড়িবে না, সে স্বাভাবিক, কেন না, সে দুপুরে নিশ্চিন্ত মনে গাছের শীতল ছায়ায় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিল।

মিঃ স্মার্টের কাছে এইবার ব্যাপারটা সত্যসত্যই জটিল হইয়া দাঁড়াইল। মনে মনে বেশ রাগও হইয়াছিল। স্মার্ট আবার গ্রামের ভিতর অনুসন্ধান করিতে চলিলেন – এই আশায় যদি গ্রাম দেখিবার জন্য গ্রামের ভিতরে তাহারা কোথাও যাইয়া থাকে।

ইউরোপীয় পোষাক পরা এই বালক দুইটিকে এ যায়গায় চিনিয়া লইতে কোনও অসুবিধার কারণ নাই। পথে যাহাদের সঙ্গে দেখা হইল, তাহাদিগকে প্রশ্ন করা মাত্রই বলিল যে - হাঁ, তাহারা দুইটি বাচ্চা সাহেবকে কিছু আগে মরুভূমির দিকে যাইতে দেখিয়াছে। —এদেশের লোকের সময় সম্বন্ধে জ্ঞান বড় অদ্ভুত। কাজেই কতটা সময় আগে এই পথে যাইতে দেখিয়াছে, সে বিষয়ে একটা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা গেল না।

মেলা হইতে যে পথটি মরুভূমির দিকে গিয়াছে, সে পথে একজন তুর্কী সৈনিক পাহারা দিতেছিল। সে মিঃ স্মার্টকে বলিল যে,—ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে নীলরংয়ের পোষাক-পরা একটি এদেশীয় লোকের সহিত দুইটি বালককে গাধার পিঠে চড়িয়া বরাবর মরুভূমির দিকে যাইতে দেখিয়াছে।

স্মার্ট কি যে করিবেন তাহা ভাবিয়াই যেন ঠিক্ করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় কে যেন পেছন হইতে প্রশ্ন করিল - "কি হয়েছে, মিঃ স্মার্ট ? পরিচিত স্বর শুনিয়া তিনি ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—তুর্কী-সৈন্যাধ্যক্ষ ওস্‌মান বেগ।

মিঃ স্মার্টের মুখে অশোক ও দীপকের নিরুদ্দেশের কথা শুনিয়া ওস্‌মান বেগের মুখ মলিন ও গম্ভীর হইয়া গেল। ওস্‌মান বেগ তাঁহার সৈন্যদল হইতে বিশ্বাসী এবং

সাহসী ছয়জন সৈন্য লইয়া মরুভূমির দিকে চলিলেন। সৈনিকেরা আগে আগে চলিল, মিঃ স্মার্ট ও ওস্‌মান বেগ তাহাদের পেছনে পেছনে পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলেন —মরুভূমির দিকে।

এক ক্রোশ পথ পার হইয়া গেলেন, একটি জনপ্রাণীর সঙ্গেও পথে দেখা হইল না। এইবার পথ আরও ভয়ঙ্কর। বালুকাময় গভীর—প্রান্তর ভয়ানক উচু নীচু, মাঝে মাঝে বালিয়াড়ি বা বালুকাময় পাহাড়। সম্মুখের দিকের দৃশ্য অবরোধ করিয়া আছে। তাহারা একটা ছোট বালিয়াড়ি
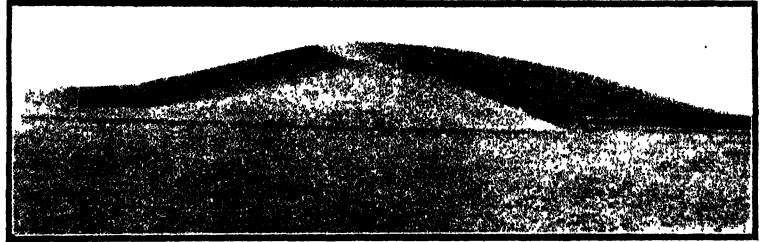
বালিয়াড়ি

পার হইয়া যেমন সমতল আসিয়া পৌছিয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে একটা শীর্ণকায় বেঁটে মানুষ পায়ে হাঁটিয়া সেদিকে আসিতেছে। সে একা। ঐ পথে আর কোন লোকজন নাই।

এই লোকটির গায়ের কাপড়-চোপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সারা শরীর ধূলিময়। মাথায় একটা পটি বাঁধা। পটির কাপড়ে জমাট রক্তের দাগ। সে অতি কষ্টে পথ চলিতেছিল। মনে হইতেছিল হয় লোকটা খুব আঘাত পাইয়াছে, কিংবা মরুভূমির দুর্গম পথে চলিতে চলিতে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। লোকটার অদ্ভুত পোষাক, আঘাতের চিহ্ন এবং নানারূপ বিপন্ন ভাব দেখা গেল, দূর হইতে তাঁহারা তাহাকে চিনিতে পারে নাই কিন্তু যখন সে মিঃ স্মার্ট ও ওস্‌মান বেগের কাছে আসিল, তখন তাঁহারা দুইজনে চিনিতে পারিলেন সে গাইড্‌—হোসেন আলি!

মিঃ স্মার্ট ও ওস্‌মান বেগ অশোক ও দীপকের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে ক্ষীণ-স্বরে উত্তর করিল—তাহাদের তুরেগ-দস্যুরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

মরুভূমির কোলে

মিঃ স্মার্ট চলিয়া গেলে—অশোক ও দীপক দুই ভাই বাগানে বেড়াইতে লাগিল। ছায়া-শীতল—নানা-জাতীয়-তরুলতা-শোভিত কানন-ভূমির দৃশ্য তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহারা অনেকক্ষণ বেড়াইল—মিঃ স্মার্ট ফিরিলেন না। একই যায়গায় আর কতক্ষণই বা ঘোরা ফেরা করা যায়, তাহারা দুইজনেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

দীপক কহিল—দাদা, চল আমরা আর একবার মেলাটা বেড়িয়ে আসি, কাল চলে গেলে আর ত এদিকে আসা হবে না।

অশোক বাধা দিয়া বলিল—মিঃ স্মার্ট যে ভাই মানা করে গেছেন!

কেন—তিনি ফিরে আস্‌বার আগেই আমরা চলে আস্‌বো। এখনও অনেক বেলা আছে।

এইরূপ ভাবে দুই ভাই কথা বলিতে বলিতে বাগানের এদিকে ওদিকে পাইচারী করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ বাগানের খিড়কীর দরজাটা খুলিয়া গেল এবং তাহাদের পরিচিত হোসেন আলি দরজার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া বলিল,—"Me—Guide—Hussein Ali" আমি তোমাদেরই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেম,—যদি মরুভূমির সেই পোড়ো বাড়ীটা দেখ্‌তে চান, তবে এইবার চলুন !

দীপক আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিল—বেশ হ'বে দাদা, খুব মজা হ'বে। আমরা ত ruinটা দেখ্‌বার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম—এইবার চল না দাদা !

—অশোক কহিল—দেখবার ইচ্ছাটা যে আমার বড় কম তা নয়, তবে তুমি কি শোন নি Consul মিঃ সার্প কি বলেছিলেন ?

হাঁ, তিনি বলেছিলেন যে মিঃ স্মার্ট যদি বাধা দেন, তবে যেতে মানা, কিন্তু মিঃ স্মার্ট ত এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নি।

হোসেন আলি হাসিয়া কহিল—বাগানের কোণে আমি গাধা ঠিক্ করে রেখেছি। চলুন, এখনও অনেকটা বেলা আছে, বেলাবেলি ফিরে আসা তেমন কিছুই কঠিন হবে না।

—দীপক সোল্লাসে কহিল—এখান থেকে ও যায়গাটা কত দূর হবে ?

বেশী কিছু না, ক্রোশ খানেক দূর হ'তে পারে।

দীপক কহিল—দাদা শুন্‌ছো ! মাত্র দু'মাইল, আমরা অনায়াসে সময় মত ফিরে আস্‌তে পারবো। মিঃ স্মার্ট এসে আমাদের ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত পাবেন।

অশোক কোন কথা বলিল না। সে গম্ভীর ভাবে খানিকটা চিন্তা করিল। তারপর কোন কথা না বলিয়া হোসেন আলির অনুসরণ করিল। তিনজনে তিনটি গাধার পিঠে চড়িয়া মরুভূমির পথে অগ্রসর হইল। তাহারা ভূগোল পড়িয়া মনে করিয়াছিল, মরুভূমি বুঝি কেবলি বিস্তৃত সমতল ভূমি। কিন্তু মরুভূমির পথ ধরিয়া যেমন তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল, তেমনই তাহাদের সে কল্পনা মন হইতে দূর হইয়া গেল। মরুভূমি ত সমতল প্রান্তর নয়, ইহার কোথাও বালুকাময় প্রস্তরপূর্ণ বন্ধুরভূমি, আবার কোন কোন স্থান সমতল, কোন কোন স্থান অসমতল,—কোথায়ও মাল্রভূমি। অশোক ও দীপক

দেখিল—যেন বালুকাসাগরের বুকে বালির ঢেউ বহিয়া চলিয়াছে। এই সেই দেশ, যেখানে বর্ষার ধারা নামিয়া আসে না, তরুলতার শ্যামল-শ্রী ফুটিয়া উঠে না, কেবল ঊষর-ভূমি। এই সেই সাহারা, পৃথিবীর মধ্যে যাহার ন্যায় বৃহত্তম মরুভূমি আর নাই। ইহার আয়তন ৩,৫০০,০০০ বর্গমাইল। আরবেরা সাহারার নাম দিয়াছে বারিবিহীন সাগর। সত্য সত্যই সাহারা বালুকা-সাগর। সাহারার পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর হইতে পূর্ব্বে মিশর দেশ পর্য্যন্ত ও উত্তরে ত্রিপলি ও টিউনিস্ হইতে দক্ষিণে চাদ হ্রদ পর্য্যন্ত সাহারা বিস্তৃত।

কোথাও প্রস্তরপূর্ণ বন্ধুরভূমি

ইউরোপ মহাদেশ ও সাহারা মরুভূমি আকারে প্রায় সমান। আজ সাহারা যেমন ঊষর প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে, পূর্ব্বে তাহা এইরূপ ছিল না। পণ্ডিতেরা বলেন, হাজার হাজার বৎসর আগে এখানে জনাকীর্ণ সুন্দর নগর ও নগরী ছিল। দেশটা সত্যই ছিল সুজলা সুফলা ও শস্য-শ্যামলা, আর এখন বালুকাময় ও প্রস্তরাকীর্ণ ভীষণ বিস্তীর্ণ প্রান্তর। কোথাও কোথাও মাটির নীচে পাহাড়ের আড়ালে পূর্ব্ব গৌরবের কোন কোন চিহ্ন আছে।

অশোক ও দীপক যেমন চলিতে লাগিল, ক্রমশঃই তাহাদের গতি মন্থর হইয়া আসিল, গাধার পা, বালুর ভিতর ডুবিয়া যাইতে লাগিল।—আর কোথায় এক ক্রোশ দূর? তাহারা এক ঘন্টার উপর চলিয়াও যে সেই পোড়োবাড়ীর কোন নিদর্শনই দেখিতে পাইল না।

অশোক অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছিল, সে কহিল—এ ভাবে যদি চল্‌তে হয়, তবে আমরা কোনমতেই ঠিক সময়ে মেলায় ফিরে যেতে পারবো না।

হোসেন্ আলি কোন কথা কহিল না। সে সম্মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। কি যেন কিসের সে একটা প্রত্যাশা করিতেছিল। সম্মুখে একটা মস্ত বড় বালুকাময় গিরিশ্রেণী। তাহার পেছনে কি আছে, তাহা কিছুই দেখা যাইতেছিল না। তাহারা চলিতে লাগিল।

এমন সময় সেই পাহাড়ের একদিক হইতে এক সঙ্গে কতকগুলি ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপর মুহূর্ত্ত মধ্যে সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল তাহাদের সম্মুখে একদল ভীষণ-দর্শন-মূর্ত্তি মরুভূমির দস্যুদল। তাহাদের অশ্ব-ক্ষুরের চালনায় আকাশে ধূলির-মেঘ উঠিয়াছে, সে মেঘে চারি-দিক ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। একটা দুঃস্বপ্নের মত পলক মধ্যে এই দস্যু-দল যে কোথা হইতে আসিল, তাহা অশোক ও দীপক কোন প্রকারেই বুঝিতে পারিল না। চারিদিক দিয়া আসিয়া এই ঘোড়-সোয়ারেরা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। হোসেন আলি গাধার পিঠ হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার মাথাটা বালুর মধ্যে ডুবিয়া গেল। কয়েকটা দস্যু ঘোড়া হইতে নামিয়া আসিল এবং অশোক ও দীপককে গাধার পিঠ হইতে নামাইয়া লইয়া তাহাদের মাথার উপর একটা কাপড় ফেলিয়া দিল। তারপর তাহাদের ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া লইয়া বেগে অশ্ব চালাইয়া দিল।
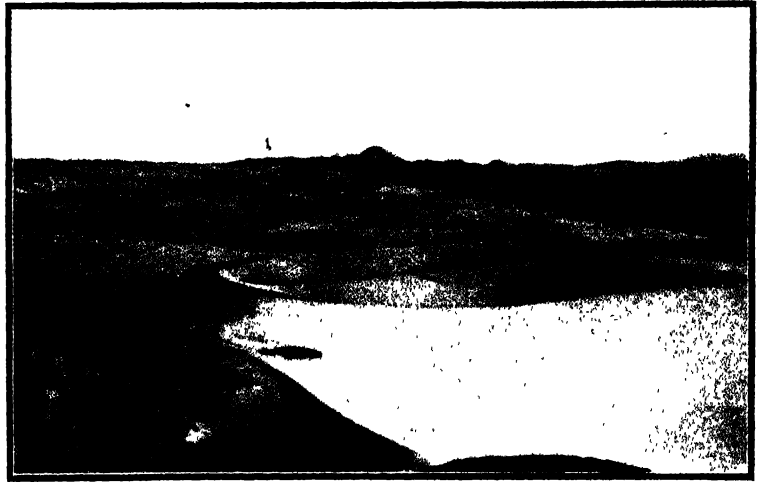
বালুকাময় গিরিশ্রেণী

অশোক ও দীপকের মনেও হয় নাই যে এমন অতর্কিত ভাবে একটা বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে ? এ কি হইল ? সেই জাহাজ-ডুবি ! তারপর হঠাৎ এমন ভাবে দস্যুদের আক্রমণে তাহারা কি যে করিবে, কেমন যে তাহাদের মনের অবস্থা হইল, তাহা তোমরা যদি কেহ এইরূপ বিপদে পড়িতে তাহা হইলে বোধ হয় বুঝিতে পারিতে ! এ যেন উপন্যাসের কাহিনী, এ যেন একটা স্বপ্ন সত্যরূপে আসিয়া প্রকাশ করিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহারা মনের আনন্দে পথ চলিতেছিল, তখন ভাবিতেও পারে নাই যে এমন একটা বিপদ ঘটিবে ! কিন্তু হায় ! এমনই তাহাদের দুর্ভাগ্য যে আজ তাহারা মরুভূমির দুর্দ্দান্ত দস্যুদের হস্তে বন্দী হইল ! ইহারা তাহাদিগকে কোন্ পথে কোথায় লইয়া যাইতেছে, কিছুই জানে না। হয় ত মৃত্যু, নতুবা চিরজীবনের জন্য এই দুর্দ্দান্ত দস্যুদের কাছে ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে হইবে।

কি ভীষণ ও বন্ধুর পথ। তারপর তাহাদের চোখ মুখ বন্ধ ! শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিবার পর্য্যন্ত জো নাই। অশ্বের দ্রুতগতির সঙ্গে উঠা-নাবা করিতে করিতে তাহাদের বুকের হাড় পাঁজরা ক'খানা যেন ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া যাইতেছিল। পথের ত শেষ নাই ---কোথায় পথের কত দূর---আর কত দূর। কোথায় তাহাদিগকে লইয়া যাইতেছে, তাহারা যে তাহার কিছুই জানে না ! তিন চারি ঘণ্টা পথ চলিবার পর দস্যুর দল একটা যায়গায় আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তারপর তাহাদিগকে ঘোড়ার পিঠ হইতে নামাইয়া আনিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চোখ ঢাকা থাকায়, প্রথমটা---তাহাদের কাছে সবই অন্ধকার বলিয়া মনে হইতেছিল। এইবার তাহারা বন্ধনমুক্ত হইয়া অনেকটা আরাম বোধ করিল। হাত পা নাড়া-চাড়া করিবার সুযোগ পাইয়া আনন্দ অনুভব করিল।

দীপক চাপা গলায় অশোককে কহিল,---এরা আমাদের দিয়ে কি করবে দাদা ! অশোক বিষণ্ণ মনে করুণ-কণ্ঠে কহিল- -কি করে বল্‌বো ভাই ! মনে হয় এরা আমাদের বন্দী রেখে টাকা আদায় করবার ফন্দী এটেছে। যদি মেরে ফেলবার ইচ্ছে হ'ত, তাহলে যে অনেক আগেই মেরে ফেলত।

দীপক কহিল---দাদা, আমার দোষেই ত এই বিপদ হ'লো। আমার কিন্তু খুবই দুঃখ হচ্চে। আমি যদি জেদ্ না করতুম, তা'হলে তুমি কখনো এখানে আস্‌তে না।

যা হবার হয়েছে দীপক! অতীতের কথা ভেবে কোন ফল নেই। এই বলিয়া স্নেহভরে সে দীপকের পিঠ চাপড়াইয়া দিল। এখন আমাদের মুষড়ে গেলে ত চল্‌বে না, সবটা ভেবে, দেখে-শুনে চল্‌তে হবে।

এই কথা বলিয়া অশোক, একবার চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। এখানকার সব দৃশ্যই যেন নূতন। সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। মরুভূমির দিগন্তনিলীন প্রান্তরের শেষ প্রান্তে সূর্য্যের শেষ-রশ্মি লাল আভা বিস্তার করিয়া ডুবিয়া যাইতেছে। আর সম্মুখেই অপূর্ব্ব দৃশ্য! সেই ভাঙ্গা মন্দির! সেই ঝরণা! যে চিত্র তাহারা তুর্কী সেনাপতির কাছে দেখিয়া মরুভূমির এই দৃশ্য দেখিবার জন্য মুগ্ধ হইয়াছিল। অশোক তাড়াতাড়ি তাহার পকেট হইতে সেই ফোটোগ্রাফখানি বাহির করিল। তারপর দুইজনে একান্ত উৎসুক-ভাবে চিত্রের সহিত সবটা মিলাইয়া দেখিতে লাগিল। প্রত্যেকটি দৃশ্য সেই চিত্রের সহিত হুবহু মিলিয়া যাইতেছিল। সেই ধ্বংসোন্মুখ পাথরের থাম কয়টি, সেই খিলান, সেই পাথরের ভাঙ্গা সিঁড়ি, সেই পাথরের গোলাকার জলাধার, সেই খর্জ্জুর-বনশ্রেণী, তারপর ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী, আর সম্মুখে পড়িয়া আছে, একটা হরিণের কঙ্কাল! তাহারা যখন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া এইরূপ ভাবে চারিদিকের দৃশ্য দেখিতেছিল,—এমন সময় কয়েকজন দুর্দ্দান্ত দস্যু তাহাদের ঘোড়াগুলিকে ভাঙ্গা বাড়ীটার একদিকে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। অশোকের হাতের ছবিটা দেখিয়া যে লোকটা তাহাদের অতি কাছে ছিল, সাপ দেখিলে মানুষ যেমন চমকাইয়া উঠে, তেমনি চমকিত হইয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে একটা বিকট চীৎকার করিয়া দু'হাত পিছাইয়া গেল!

তাহার চীৎকার শুনিয়া দলের আরও কয়েকটা লোক ছুটিয়া আসিল, তারপর আরও অনেকে আসিল। ইহাদের দেখিয়া মনে হইল যে--একটা বিরাট তুরেগ দস্যুদলের অন্তর্ভূত ইহারা কয়েকজন মাত্র এই ভাঙ্গা মন্দিরের কাছে থাকে! অশোক ও দীপককে প্রায় পঞ্চাশজন লোক আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই ছবিখানি কি তাহা দেখিবার জন্য সকলের মধ্যেই বেশ একটা ব্যগ্রভাব দেখা গেল।

মরুভূমির অধিবাসী দস্যুদল—দুর্দান্ত ও সাহসী হইলেও আবার ভূত-প্রেতের ভয়টা একটু বেশী করে। তাহারা কোন দিন ফোটোগ্রাফ দেখে নাই, কাজেই এই চিত্রখানি দেখিয়া তাহারা ভয়ে ও বিস্ময়ে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। একজন লোক, অশোকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অশোক এই সময় মধ্যে আলোক-চিত্রখানি পকেটের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিল। ঐ লোকটি অশোক ও দীপককে দুই হাতে ধরিয়া লইয়া ভাঙ্গা বাড়ীটার এক পাশে লইয়া গেল। সেখানে আগুন জ্বালা হইয়াছিল। মরুভূমিতে দিনের বেলা যেমন প্রচণ্ড উত্তাপ থাকে, রাত্রিকালে আবার তেমনি ঠাণ্ডা পড়ে, তখন খুবই শীত বোধ হয়। এমন কি রাত্রে জল জমিয়া বরফ হইয়া পড়ে। অশোক ও দীপককে আগুনের পাশে বসাইয়া রাখিয়া ঐ লোকটা দলের অন্য লোকদের কাছে যাইয়া বসিল।

চীৎকার করিয়া দুই হাত পিছাইয়া গেল

এই সুযোগে অশোক, দীপককে কহিল,—ভাই, এখন ভয় পেলে চল্‌বে না। বেশ সাহস করে চল্‌তে হ'বে। দীপক কোন কথা বলিল না। সে চুপ করিয়া বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া রহিল।

অদূরে দস্যুদলের মধ্যে একটা তর্ক-বিতর্ক চলিতেছিল। কেহ কেহ উত্তরদিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া কি যেন বলিতেছিল! বোধ হয় এই বন্দীদের বিনিময়ে কিছু টাকা পাইবার কথাটাই তাহাদের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল।

দীপক কহিল—দাদা, আমার এমন ক্ষুধা পেয়েছে যে একটা আস্ত উটকে খেয়ে ফেল্‌তে ইচ্ছে হয়েছে। তুমি যদি ওদের কথা বুঝতে, তাহ'লেও বা কিছু খাবার জিনিষ চেয়ে নিতে পারতে।

অশোক কহিল—এই লোকগুলির পোষাক দেখে মনে হচ্চে যে এরা তুরেগ জাতিয় লোক। —সেই যে সেদিন আমি ত্রিপলিতে একটা তুরেগের কপালে পটি বেঁধে দিয়েছিলুম, সে যাবার আগে হু'বার এ-মিন্‌-আ বলে একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিল। আমি ত জানি না ভাই এ-মিন্‌-আ শব্দের মানে কি! যদি ঐ কথাটা এদের কোন সাঙ্কেতিক শব্দ বা কারো নাম হ'য়ে থাকে, তাহলে হয়ত আমাদের কিছু ভাল হ'তে পারে! — দেখা যাক্ না ঐ শব্দটা উচ্চারণ করে, কোন ফল হয় কিনা!

—অশোক ত্রিপলির পথের সেই তুরেগটির স্বরানুকরণ করিয়া এ-মিন্‌-আ'—'এ-মিন্‌-আ শব্দটি তুইবার উচ্চারণ করিল। দীপকও সেই স্বরের অনুকরণ করিল।

এই শব্দ উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য্য ফল ফলিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে দস্যুদলের কথাবার্ত্তা, হৈ-চৈ সব থামিয়া গেল। এ-মিন্‌-আ'—এ-মিন্‌-আ শব্দটি তুই ভাই আবার উচ্চারণ করিল।

—এমন সময় সেই দলের মধ্যে কে যেন একজন বলিয়া উঠিল—কে আমায় ডাকছো? সঙ্গে সঙ্গে দলের মধ্য হইতে একজন দীর্ঘাকার ব্যক্তি অশোক ও দীপকের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, অগ্নির স্পষ্ট আলোকে খানিকক্ষণ অশোকের দিকে এক লক্ষ্যে তাকাইয়া অশোকের হাত ধরিয়া বলিল—ইয়া হাবিবি! বন্ধু! তুমি! —একথা বলিয়াই সেই লোকটি তাহার কপাল দেখাইল। অশোক দেখিল এ সেই লোক, ত্রিপলিতে যাহার ক্ষতস্থানে সে একদিন রুমাল দিয়া পটি বাঁধিয়া দিয়াছিল। —লোকটি তাহার দলের লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কি যেন বলিল? —তৎক্ষণাৎ একজন লোক অশোক ও দীপককে বসিবার জন্য একখানি শাল পাতিয়া দিল। আর একজন লোক কয়েকখানি রেকাবিতে করিয়া—বজ্‌রার রুটি, পাকা খেজুর, আর বাটিতে করিয়া উটের তুধ আনিয়া তাহাদের কাছে উপস্থিত করিল। দীপক পরমানন্দে খাইতে খাইতে বলিল—দাদা, মেনে নিতেই হবে যে তুমি খুবই বুদ্ধিমান্ ছেলে। —আঃ খেয়ে বাঁচলুম।

দুই ভাইয়ের খাওয়া শেষ হইলে সেই যে এমিনা সে নিজে আসিয়া তাহাদিগকে পোড়ো-বাড়ীটার একপাশে বারান্দায় বেশ সুন্দর বিছানা করিয়া দিল এবং রাত্রিতে শীতে যাহাতে তাহাদের কোন কষ্ট না হয় সেজন্য দু'খানি নরম কম্বল রাখিয়া গেল। তারপর এমিনা চলিয়া গেল।

বন্ধু! তুমি—

অশোক বলিল—দীপক, তুমি আর ভয় করোনা। দস্যুরা যখন আমাদের সঙ্গে বসে খেয়েছে, তখন তারা কখনই আমাদের প্রাণে মারবে না। তারপর এমিনা আমাদের অপকার করবে, এত আমার মনেই হয় না। আর আমরা ত্রিপলি হ'তে যে অনেক দূরে এসেছি তাও মনে হয় না। তারপর—হোসেন আলি আহত হলেও নিশ্চয়ই সে মারা যায়নি। সে এ সংবাদ দিবে, তখন আমাদের উদ্ধারের জন্য মিঃ সার্প ও মিঃ স্মার্ট নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবেন।

দুইজনে এই বিপদের মধ্যে পড়িয়াও নিশ্চিন্ত আরামে মরুভূমির বুকে, ভাঙ্গা বাড়ীর একটা নির্জ্জন বারান্দায় ঘুমাইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মরুভূমির পথে

অশোক ও দীপক রাত্রিতে বেশ ঘুমাইল। তাহারা যে চারিদিকে দুর্দ্দান্ত দস্যুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত একথা তাহাদের মনেও হয় নাই। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামী যেমন দণ্ডিত হইবার পূর্ব্বরাত্রে বেশ নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যায় বলিয়া শোনা যায়, এও ঠিক্ সেইরূপ।

—রাত্রি তখনও শেষ হয় নাই। তখন অন্ধকার বেশ আছে। এমন সময় কে যেন তাহাদিগের হাত ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিল। তাহারা হঠাৎ জাগিয়া দেখিল যে এমিনা মাথা নীচু করিয়া তাহাদিগকে উঠিবার জন্য আদেশ করিল। সে এমনভাবে কথা কয়টি বলিল এবং তাহার পশ্চাদানুসরণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিল যে সে আদেশ অমান্য করার সাধ্য যেন কাহারও নাই। তাহারা তৎক্ষণাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং এমিনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ভাঙ্গা বাড়ীটার সম্মুখে একটা উট দাঁড়াইয়াছিল, পলক-মধ্যে অশোক ও দীপককে সেই উটের পিঠে চড়াইয়া দিল। অন্ধকারের মধ্য দিয়া উট চলিতে আরম্ভ করিল।—হায়রে অদৃষ্ট, তাহাদের মুক্তির আশা বুঝি চিরদিনের জন্য ব্যর্থ হইল।

মরুভূমির দিগন্ত বিস্তারের মধ্য দিয়া দস্যুদল চলিয়াছে। উট ও ঘোড়া যাইতেছে। কোন শব্দ নাই। ঘোড়ার ক্ষুরেরও কোন শব্দ নাই উটের পায়েরও নাই। ছায়ার মত নীরবে তাহারা মরুভূমির পথে চলিতে লাগিল। দলের এতগুলি [illegible] উটের পিঠে ও ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া যাইতেছে, যেমন জন্তুগুলির গতির মধ্যে কোন [illegible] নাই, তেমনি এই দুর্দ্দান্ত যাত্রিদলের কাহারও মুখেও কোন শব্দ নাই। এ যেন মরণের যাত্রী।

এইবার তাহাদের তেমন কষ্ট হইতেছিল না। তাহাদের হাত-পা বা মুখ বাঁধা ছিল না। তাহাদের দুইজনকে একটি উটের পিঠের দুই পাশে শুধু বসাইয়া দেওয়া হইয়া-

ছিল। উটের পিঠে তাহারা পূর্ব্বে আর কোন দিন চড়ে নাই, সেজন্য তাহাদের যা কিছু অসোয়াস্তি বোধ হইতেছিল। কেননা উটের গতি-ভঙ্গী ও শরীরের দোলনী একেবারেই আরামদায়ক ছিল না। কি উট কি ঘোড়া সকলেরই গতি ছিল ধীর, কতকটা হাঁটিয়া চলার মত। কেননা, উট ও ঘোড়ার পা গুলি মরুভূমির বালুকারাশির মধ্যে বসিয়া যাইতেছিল।

এইভাবে তাহারা প্রায় তিন ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতেছিল। তেমনি নীরবতা—তেমনি স্তব্ধতা। এইবার তাহারা দিনের আলো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহারা মরুভূমির বিশালতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছিল। সমুদ্রের বুকে যেমন সূর্য্যোদয়ের অপূর্ব্ব শোভা, মরুভূমির অসীম প্রান্তরে সূর্য্যোদয়ও তেমনি বিচিত্র ও মনোরম। প্রথমে গোলাপি আভা দিগন্তসীমায় বিকশিত হইয়া উঠিল। তারপর রক্ত-করবীর লালিমা আকাশের গায় ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে প্রচণ্ড দীপ্ত তপন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় বিরাট আকারে প্রতিভাত হইলেন। মরুভূমির বালুকা-সাগরের তরঙ্গ-বুকে সে অগ্নিকণা লেলিহান জিহ্বা মেলিয়া ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। সে কি ভীষণ দৃশ্য !

মরুভূমির একটী মনোরম ও বিচিত্র দৃশ্য

এইবার তাহারা দেখিল যে তাহাদের দলের লোক সংখ্যা বড় কম নহে। কিন্তু

এখন সাহারা মরুভূমিতে আসিয়া তাহাদের সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ও উটগুলির গতি বাড়িয়া চলিতেছিল। এইবার তাহারা মরুভূমি— এই সাহারা মরুভূমি— ভূগোলে যে মহা মরুভূমির কথা শুধু –'The great desert'ই পড়িয়াছে, তাহাতে কোন কল্পনার ছবি তাহাদের কাছে ফুটিয়া উঠে নাই,
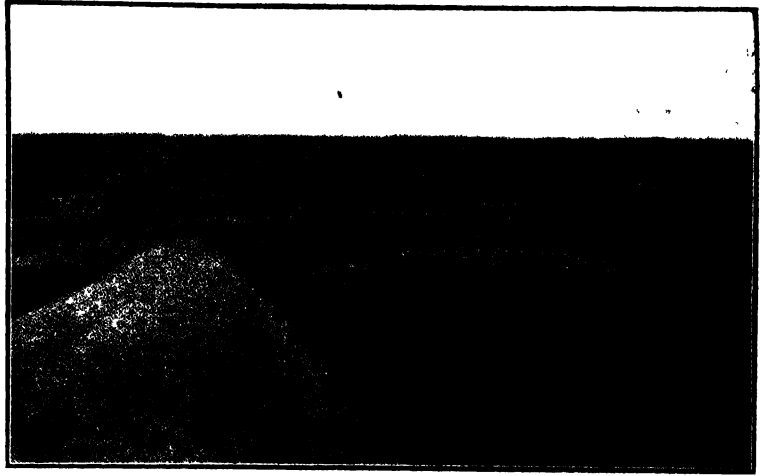
মরুভূমিতে সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য
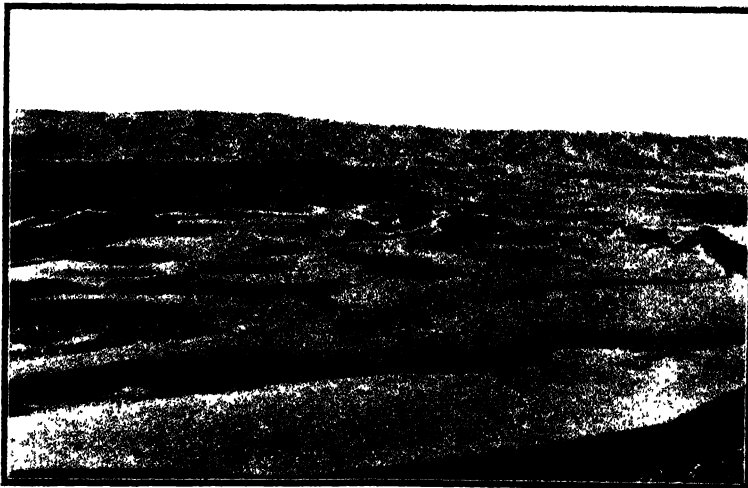
মনে মনে ভাবিয়াছে বড় জোর একটা বালুকাকীর্ণ প্রান্তর। মনে হইতেছিল এ কি ভীষণ মৃত্যুর রাজ্য। আকাশে এমন অগ্নিজ্বালা বুকে করিয়া ত পৃথিবীর কোন দেশে সূর্য্য উঠে না, কোন দেশের সূর্য্য ত এমন করিয়া

আগুনের ঢেউ যেন উন্মত্ত বাতাসে [illegible]-হা শ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে

আগুন ছড়ায় না। সত্য সত্যই দিকে দিকে প্রান্তরে প্রান্তরে মরুভূমির তরঙ্গায়িত বুকে অগ্নি জ্বলিতেছে। এক একটি বালুকণা যেন এক একটি অগ্নি-কণা। তারপর ঢেউয়ের পর ঢেউ সে যেন আগুনের ঢেউ, উন্মত্ত বাতাসে হা-হা-হা শ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথায় কোন্ অগ্নিপুরে, তাহাই বা কে জানে? অশোকের ও দীপকের মনে হইতেছিল—যদি গোটা পৃথিবীর লোকগুলি মরুভূমির বুকে জয়-যাত্রা করে, তবে তাহাদিগকে কেমন দেখাইবে? যেন পিপীলিকার সারি। আকাশ নীল ও নির্ম্মল। তেমন নির্ম্মল নীল, তেমন আকাশের মাধুর্য্য মরুভূমির দেশ ছাড়া, অন্য দেশে কখনও দেখা যায় না। যোজনের পর যোজন দূরের একটি খেজুর গাছও বেশ সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতেছিল। তারপর আশে-পাশে কোথাও বালুর পাহাড় মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। কোথাও পুঞ্জীভূত প্রস্তররাশি। কোথাও কণ্টক গুল্ম। কোথাও বালুকা-প্রান্তর সমতল—কোথাও হ্রদের গভীরতার ন্যায় গভীর। এই সেই মরুভূমি রাত্রিতে পাহাড় হইতে গর্জ্জন করিতে করিতে সিংহেরা দলে দলে নামিয়া আসে। হায়েনার বিকট আর্ত্তনাদে মরুভূমির আকাশ ও বাতাস ধ্বনিত হইয়া উঠে। কোনও হতভাগ্য মরুযাত্রীকে আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইলে তাহার রক্ত শুষিয়া খায়। অতি দূরে—দূরে দুই একটি ধূসর পর্ব্বত-শ্রেণী মরুভূমির বুকে বৈচিত্র্যের আভাস দেয়। পৃথিবীর—কত জাতির উত্থান ও পতন হইল, কত বন নগর হইল, কত নদী শুকাইল, কত জাতি মরিল, কত

গর্জ্জন করিতে করিতে সিংহেরা দলে দলে নামিয়া আসে

জাতি নূতন তেজ ও দীপ্তি লইয়া অজেয় হইয়া উঠিল, কিন্তু মরুভূমি—সেই মরুভূমিই আছে।

সেই কবে এক বিশাল সাগর তাহার তপ্ত নিঃশ্বাসে শুকাইয়া গিয়া এই মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, সেদিনকার সেই বেদনার তপ্ত শ্বাস, সেই সুগভীর পুঞ্জীভূত বেদনা, যেন এই মরুভূমির বালুকার বুকের বহ্নি-জ্বালাময় নিঃশ্বাসে প্রকাশ পাইতেছে।—সেই মরুভূমি সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে—ধূ-ধূ-ধূ করে বালুকারাশি।

সূর্য্য ক্রমশঃ আকাশের উচ্চশিখরে উঠিতে লাগিল। বেলা বাড়িতে লাগিল। আকাশ ও প্রান্তরে, সূর্য্যের প্রখর কিরণ ও বালুকণার মধ্যে যেন দ্বন্দ্ব চলিতে আরম্ভ হইল, কে বড়? কে বেশী জ্বালাময়, কার বেশী প্রতাপ? ঘোড়াগুলি যেন আর চলিতে পারিতেছিল না, এমন কি 'মরুভূমির জাহাজ' বলিয়া যাহারা পরিচিত সেই উটগুলির গতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। উটের পিঠের এবং ঘোড়ার পিঠের আরোহীরা মুখে একটি কথা না বলিলেও যে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছিল। দুই একটা খেজুর গাছ দেখা যাইতেছিল, তাহাদের পাতাগুলি বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। দুই একটা শকুনি আকাশের অনেক উপরে উঠিয়া পাখা দু'টি মেলিয়া দিয়া অতি ধীরে ধীরে উড়িতেছিল, যেন তাহারাও পাখা দুইটির আবরণে সূর্য্যের প্রখর কিরণ-জ্বালাকে নিবৃত্ত করিতে চাহিতেছিল। কোথায়—কোথায়! আর কত দূরে এই প্রান্তরের শেষ? বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতেছিল যে এত বালুকা—সাগর নয়, এ যেন তরল অগ্নিসাগর, এ যেন প্রলয়ের বিরাট অগ্নিকুণ্ড। অশোক ও দীপক সভয়ে দেখিল একটা বালিয়াড়ির নীচে কতকগুলি নরকঙ্কাল। কোন কোন নিম্নভূমিতে জন্তু-জানোয়ারের কঙ্কাল—সাদা সাদা হাড়গুলি সূর্য্য কিরণে জ্বলিতেছে। যেন তাহারা বলিতেছে, এই ত পরিণাম! এই ত আমরা মহাকালের সাক্ষী।

সহসা তাহারা সকলে একসঙ্গে দেখিতে পাইল যে তাহাদের সম্মুখভাগে একটা খর্জ্জুরকুঞ্জ। শ্যামল খর্জ্জুরকুঞ্জের সম্মুখে স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ একটি হ্রদ। সেই নির্ম্মল জলে ঢেউ নাচিতেছে, ঢেউ খেলিতেছে! বল দেখি কি এ? তোমরা মরুভূমি 'মরীচিকার'

(Mirage of the desert) কথা শুনিয়াছ, এ সেই মরীচিকা। অশোক ও দীপক মরীচিকার কথা বইতেই শুধু পড়িয়াছে, কোনদিন চোখে দেখে নাই, তাই তাহারা এই মরীচিকা দেখিয়া আনন্দে অভিভূত হইয়াছিল। কিন্তু যাহারা অভ্যস্ত মরুযাত্রী তাহারা মরুভূমির এই মরীচিকার মায়ায় ভোলে না। তাহারা মনে করে এত আর কিছু নয় মরুভূমির মরণ-লীলা।

দূরের এই মরীচিকা দেখিয়া মরুযাত্রীরদল ভয়ে ও বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিল, তাহারা ঈশ্বরের নাম করিল। তাহাদের বিশ্বাস যে মরীচিকা অপদেবতার লীলা।

এই মরুভূমির মরীচিকার কাছে পৌঁছিবার লোভে কত মরুযাত্রী যে প্রাণ হারাইয়াছে তাহার অবধি নাই। জলের আশায় তাহারা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে, কিন্তু

মরুভূমি—মরীচিকা

কোথায় সে তৃষাহারী পানীয়? এই কাছে, এই দূরে। এইভাবে মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতেই তাহাদের প্রাণ গিয়াছে।

অশোক ও দীপক প্রথমে মরীচিকার মনোহর শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সেই জলের খেলা, সেই খর্জ্জুর-বীথি যেন অস্পষ্ট হইতে লাগিল। দীপক কহিল—এ নিশ্চয়ই মরুভূমির মরীচিকা, কি বল দাদা? আমরা ভূগোলে এই মরীচিকার কথা কত পড়িয়াছি। অশোক কহিল—এইবার চোখে দেখিলাম।—যাই বলো ভাই, এ এক চমৎকার দৃশ্য!

কিন্তু যেমন বেলা বাড়িয়া চলিল, তেমনই তাহাদের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিল। মুখ যেন পুড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল। তাহারা গায়ের কোট খুলিয়া মাথায় দিল। এ ভাবে কোন রকমে কতকটা সময় কাটিয়া গেল, অবশেষে তাহাদের এই যন্ত্রণার অবসান হইল। মরুযাত্রীর দল—একটি নির্জ্জন ছায়া-শীতল স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। অগাধ অনন্ত সাগরের বুকে যেমন দ্বীপ, তেমনি মরুসাগরের বুকে এই সব মরূদ্যান। এখানে চারিদিকে খেজুর গাছ। গাছগুলি অতিশয় ঘনসন্নিবিষ্ট, কাজেই রৌদ্রের কিরণ প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। গাছের ছায়ায় শ্যামল শষ্প ও তৃণরাজি। একটী বৃহদাকারের ইদারা। ইদারাটি সুমিষ্ট জলে পরিপূর্ণ। এখানে যাত্রীদল খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিল এবং খাওয়া দাওয়া করিল। রুটি, খেজুর ও সেই উটের দুধ আর ইদারার সুমিষ্ট শীতল জল পান করিয়া তাহাদের ক্লান্তি ও শ্রান্তি অনেকটা দূর হইয়াছিল।

আবার যাত্রা আরম্ভ হইল। সেই সূর্য্যের প্রখর কিরণ, সেই বালুকার তীব্র জ্বালা, সেই সুগম্ভীর মৃত্যু-নীরবতা, নিঃশব্দ নিস্তব্ধ ভাব সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছে। ক্রমে বেলা পড়িয়া গেল। গোধূলি দেখা দিল, তব—তবু যাত্রার শেষ নাই, এ যেন অনন্তের যাত্রা! কে জানে কোথায় শেষ!

সূর্য্য অস্ত গেল। দেখিতে দেখিতে সেই বিশাল মরুভূমির বুকে রাত্রি তাহার কালো বসনখানি ফেলিয়া চারিদিক আচ্ছাদিত করিল। রাত্রির অন্ধকারে অশোকের ও দীপকের মনে হইল মরুভূমির ভীষণতা যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। তাহাদেরও যাত্রা চলিয়াছে,—কোথায় কখন শেষ হইবে?

তিন চার ঘণ্টা পরে চাঁদ উঠিল। সেই অসীম অনন্ত মরুভূমির বুকে চাঁদের

আলোতে চারিদিক হাসিতে লাগিল। বালুর কণায় কণায় মণি জ্বলিতে লাগিল। কি সে দীপ্তি—কি সে তৃপ্তি! একসঙ্গে মরুযাত্রীদল আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—'মশাল্লাই'—ঈশ্বর দয়াময়!

এদিকে অশোক ও দীপক সারাদিনের এই অনভ্যস্ত মরুযাত্রায় এমন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহাদের শরীর অবশ হইয়া পড়িয়াছিল, চোখ দু'টি নিদ্রাজড়িত হইয়া অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল। এ যেন নিদ্রা নয়—তন্দ্রা নয়, জাগরণও নয় এ যেন কেমন একটা অবসন্ন ভাব। আর কত দুঃস্বপ্ন আসিয়া তাহাদের কাছে দেখা দিতেছিল। কখনও তাহারা ঝড়ের বুকে, বালুকার ঝড়ে পড়িয়া দৌড়াইতেছে, কখনও তাহারা দেখিতেছে মরুভূমির বুকে ছোট এক পাহাড়ের গায় একটা গহ্বর, সেখানে স্তূপীকৃত কঙ্কাল, মানুষের, হাতীর, বাঘের, হায়েনার ও সিংহের। আবার দেখিল এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলে প্রাণ পাইয়াছে, তাহারা গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়াছে, তাহাদের দুই ভাইকে আক্রমণ করিতে,—কোথায় পলাইবে? কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে? গুহার মুখের কাছে আসিল, বাহির হইতে পারিল না। সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটা ভীষণাকৃতি গরিলা মূলার মত দাঁত বাহির করিয়া তাহাদিগকে খাইতে আসিয়াছে—কি ভয়ঙ্কর!

মরুযাত্রীদল যখন রাত্রির বিশ্রামের জন্য আসিয়া তাঁবু ফেলিল, তখনও তাহারা ঘুমাইতেছিল। রাত্রিতে কি হইল, কি ভাবে রাত্রি কাটিল, তাহা তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই। সকালে জাগিয়া দেখিল, তাহারা একটি ছোট তাঁবুর ভিতর কম্বলের উপর শুইয়া আছে। তাঁবুটি উটের লোমের তৈরী। রাত্রিতে এ যায়গাটি কেমন, তাহা তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। প্রত্যূষে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল—একটী পর্ব্বতশ্রেণীর পায়ের তলে—ছোট একটি ঢালু অধিত্যকায় তাহাদের তাঁবু পড়িয়াছে। অধিত্যকার উপরটা—ঘনসন্নিবিষ্ট খর্জ্জুর বৃক্ষশ্রেণীতে পরিপূর্ণ। সুধু খেজুর গাছই যে এখানে রহিয়াছে তাহা নয়, আফ্রিকার ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে সকল বড় বড় গাছ জন্মায়—সেই জাতীয় অনেক গাছ এই উপত্যকাটিকে শ্যামল-শ্রী দান করিয়াছে। অনেকগুলি তাঁবু ফেলা হইয়াছে। তাঁবুগুলি যে বেশ একটা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ফেলা হইয়াছে, তাহা নহে, একটি উপরে, একটি নীচে, একটি এ কোণে, একটি অন্য কোণে—এইরূপ।—তাঁবুর আশেপাশে দুই একটি

গুরবি (কুঁড়ে ঘর)ও আছে। এই গুরবি গুলি—শুক্‌নো ঘাস দিয়া তৈরী। কাঠের কাঠামো তৈরী করিয়া এই গুরবি গুলি উত্তর আফ্রিকার লোকেরা তৈরী করে। এ কাজে উত্তর আফ্রিকার লোকেরা এমন নিপুণ যে, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তের মধ্যেই এক একটি বড় বড় গুরবিস্ তৈরী করিয়া ফেলে।

এই স্থানটির চারিদিকে কলার পাতার মত বড় ও লম্বা পত্রবিশিষ্ট এক জাতীয় গাছ অনেকগুলি থাকায় সূর্য্যের প্রখর কিরণ কোনরূপেই এখানে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির বুকে শ্যামল-শ্রীসম্পন্ন এই নির্জ্জন বনভূমি কি সুন্দর! কি তৃপ্তিপ্রদ!

অধিত্যকার উপরটা ঘনসন্নিবিষ্ট খেজুর গাছে পূর্ণ

দীপক কহিল—তুরেগদের বাহাদুর বল্‌তে হবে দাদা! যোজনের পর যোজন বিস্তৃত মরুভূমির বুকে কোথায় একটি মরূদ্যান আছে,—কোথায় শীতল জল আছে, খাদ্য আছে, বিশ্রামের স্থান আছে, সে সব সংবাদ এরা কিন্তু বেশ জানে!

সুধু যে এ স্থানটি ছায়া-শীতল ও মনোরম তা নয়, কার সাধ্য শত্রুরা সহজে এদের আক্রমণ করে। আমরা এখন নিরুপায়, এরা আমাদের যেখানে নিয়ে যাবে, সেইখানেই যেতে হবে। জানি না কোন দিন মুক্তি পাব কি না!

—দীপক কহিল—না জানি কাকা, কত ভাব্‌ছেন। অশোক অশ্রুপূর্ণলোচনে

কহিল—বাবা যখন আমাদের কথা শুনবেন, তখন একেবারেই মুষড়ে পড়বেন। কিছু টাকাকড়ি আদায় না করে যে এরা আমাদের ছেড়ে দেবে, তা মনে হয় না। তবে দস্যু হলেও এ পর্য্যন্ত এরা আমাদের প্রতি কিন্তু খুবই ভদ্র ব্যবহার করেছে!

দীপক বলিল—আমরা ইংরাজের প্রজা (British subjects) ইংরাজ-রাজ আমাদের উদ্ধারের জন্য কি চেষ্টা করবেন না!

এমন সময় তাহারা দেখিল এক যায়গায় কয়েকটি তুরেগ ছেলে খেলা করিতেছে। ছেলেগুলি বোধ হয় পূর্ব্বে এমন অল্প বয়স্ক বন্দী দেখে নাই। ছেলে কয়টির সঙ্গে অশোক ও দীপকের অতি সহজেই ভাব হইয়া গেল। দীপক তাহাদিগকে নানারূপ খেলা দেখাইতে লাগিল। ছেলের দলে হাসির লহর বহিয়া গেল।

এইসব নবপরিচিত বালকদের সঙ্গে যখন অশোক ও দীপকের বেশ ভাব হইতেছিল, এমন সময় একজন তুরেগ-সর্দ্দার আসিয়া হস্তদ্বারা তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল।

অশোক ও দীপক—তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি বড় তাঁবুর কাছে আসিল। সেই তাঁবুর দরজার সম্মুখে একখানি গালিচার উপর শুভ্রকায় সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি একজন লোক বসিয়াছিলেন।

অশোক ও দীপক তাঁহাকে সম্ভ্রমের সহিত অভিবাদন করিল।

সেই লোকটি একটু হাসিয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তাহাদের সম্মুখে একজন তুরেগ যোদ্ধা দাঁড়াইয়াছিল। তাহার কোমরে রূপার বাঁটওয়ালা একখানা ছোরা এবং দুইটি পিস্তল কোমর-বন্ধের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তাহার দীর্ঘ দেহ ও বলিষ্ঠ শরীর। তাহার মুখের রঙ এবং মাথার চুলের রঙ অন্যান্য তুরেগদের অপেক্ষা একটু লালচে ধরণের। এই লোকটিকে দলের একজন সর্দ্দার বলিয়া মনে হইল। লোকটিকে চারিদিক ঘিরিয়া দুর্দ্দান্ত তুরেগেরা জনতা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

অশোক ও দীপক ভাবিতেছিল, না জানি দলের সর্দ্দার তাহাদিগকে কত না প্রশ্ন করিবেন। কিন্তু তিনি একবার মাত্র তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চারিদিকের জনতার দিকে তাকাইয়া ছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

মুক্তির পথে

চারিদিকের লোকগুলি এই বালক দুইটিকে সন্দেহের চোখে দেখিতেছিল। এইখানে আসিয়া তাহাদের একটু স্বাধীনভাবে নড়া-চড়ার জো ছিল না। এদিকে কিন্তু কোনরূপ অন্যায় উৎপীড়ন বা অত্যাচার কেহ করে নাই।

তাহাদের সহিত এই অল্প সময় মাত্র যাহার পরিচয় হইয়াছে, তিনি অশোক ও দীপককে বলিলেন,—ভয় করোনা, ঘাব্‌ড়ে যেয়োনা। এখানে আর কেউ ইংরেজী জানে না। কিন্তু জান এই লোকগুলো হচ্চে ভয়ানক ধূর্ত্ত! সব কথা পরে হবে, এখন তোমাদের পরিচয়টা আমাকে বল দেখি? অশোক তাঁহার কাছে আনুপূর্ব্বিক সব কথা বলিয়া গেল। কিছুকাল পরে লোকটি বলিল—তোমাদের বাবা কি মুক্তিকর দিয়ে তোমাদের মুক্ত করে নিতে পারবেন?

অশোক কহিল—আমার বাবা গরীব নন্, তবে এত বড় লোকও নন্ যে এদের দাবী মিটিয়ে আমাদের মুক্ত করে নিতে পারবেন।

দস্যুদলের সর্দ্দার যখন এই কথা জানিতে পারিল তখন সে অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া গেল এবং বার বার 'তাবাঞ্জা'—'তাবাঞ্জা' শব্দটি উচ্চারণ করিতে লাগিল—তাহাকে ঘিরিয়া যে সব তুরেগেরা দাঁড়াইয়াছিল, সর্দ্দার তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াও কয়েকবার 'তাবাঞ্জা'—'তাবাঞ্জা' শব্দ উচ্চারণ করিল।

সাহারার বুকে

অশোক ও দীপকের নবপরিচিত বন্ধুটির নাম হ্যাডেন্। তাঁহার বাড়ী আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে। মিঃ হ্যাডেন্—কহিলেন---এদেশের এই তুরেগেরা কি চাহিতেছে জান? ইহারা মরুভূমির লোক, দস্যু-ডাকাতি করিয়া দিন কাটায়, ইহারা তোমাদের মুক্তিকর বাবদ দলের যে আশীজন লোক আছে তাহারা আশীটি বন্দুক চাহিতেছে, যদি ত্রিপলি হইতে আশীটি বন্দুক আনিয়া দিতে পার, তবে মুক্তি পাইতে পার।

আশীটি বন্দুক চাই

দুইভাই এই কথা শুনিয়া একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িল। —কি তাহাদের শক্তি আছে? আর ত্রিপলিতেই বা মিঃ সার্প ব্যতীত তাহাদের আপনার জন কে আছে? তিনি কি—তাহাদের জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করিবেন?

বালক দুইটিকে চিন্তা করিতে দেখিয়া মিঃ হ্যাডেন্ হাসিয়া বলিলেন—জান সহজ কথায় বলে শঠদের সঙ্গে শঠের মত ব্যবহার কর্‌তেই হয়। এখানে 'না' বল্‌লে কোন ফলই ত হবেনা! এখন বিপদের হাত থেকে কিছু সময়ের জন্য মুক্তি পেতে হলে—'হাঁ' বলাই ভাল নয় কি? যদি তুরেগেরা একবার ভেবে নেয় যে তোমরা তাদের ঠকাতে চাইছ,—তবে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেলে এই বালির ভিতর পুতে রাখ্‌বে।—এরা না করতে পারে এমন কোন কাজ নেই।

—মিঃ হ্যাডেন্, অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে এ কথা কয়টি বলিলেন। অশোক ও দীপক দেখিল, মুক্তির যখন কোন দিক্ দিয়াই উপায় নাই, তখন রাজি হওয়াই ভাল। কাজেই তাহারা—'হাঁ' বলিল। তৎক্ষণাৎ কথাটা সর্দ্দারের কানে পৌঁছিল।

তুরেগেরা বড় সহজ লোক ত নয়, তাহারা সুধু কথায় সন্তুষ্ট হইবে কেন? সর্দ্দার জানাইল—বেশ ভাল কথা, এখনি ত্রিপলিতে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। চিঠি দাও। ত্রিপলিতে এই দুই বালকের যারা আত্মীয় আছেন তাঁরা চিঠি না দেখ্‌লে কি করে বুঝ্‌বেন যে এরা আমাদের হাতে বন্দী আছে।

অশোক তৎক্ষণাৎ তার পকেট হইতে ওস্‌মান বেগের চিঠি বাহির করিয়া তাহার অর্দ্ধেকটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সেই সাদা কাগজে লিখিল --

আমরা ভাল আছি, আমাদের উপর তুরেগেরা বেশ ভাল ব্যবহার করিতেছে।

অশোক ও দীপক।

তুরেগেরা সত্যই ইহাদের গায়েও হাত দেয় নাই, কিংবা কোন জিনিষপত্রও লুঠতরাজ করে নাই। করে নাই বলিয়াই ওস্‌মান বেগের লিখিত চিঠিখানি তাহার পকেটেই ছিল।

এদিকে তুরেগ-সর্দ্দার চিঠিখানা পাইয়া একজন লোকের হাত দিয়া চিঠিখানা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য একটু দূরে গেলে পর সেই সুযোগে মিঃ হ্যাডেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কি করে এদের হাতে পড়লে?

দীপক সব কথা বলিতে লাগিল এবং সে যখন হোসেন আলির নাম করিল, তখন

মিঃ হ্যাডেন্, চমকাইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—লোকটা দেখিতে কেমন বলত ?—বেশ বেঁটে সেটে, কুৎকুতে চোখ, লম্বা নাক আর অল্প অল্প দাড়ি আছে, তাই কি ?

ঠিক্ এই রকম দেখ্‌তে। অশোক আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—আপনি কি করে জানলেন বলুন ত ? আমি এ কথাই ভাবছিলাম। ও লোকটাকে তুরেগেরা মেরেছে বল্‌ছো, ওটা কিছুই নয়, ঐ শঠটার অভিনয় মাত্র। চমৎকার অভিনয় করতে জানে কিন্তু ঐ ধূর্ত্তটা। শোন তবে, তিন বৎসর আগে এই ধূর্ত্তের ষড়যন্ত্রে পড়ে আমি এই তুরেগ-দস্যুদের হাতে বন্দী হয়েছি। জান, আমাকে দাসব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রী করবার কথা হ'য়েছিল, কিন্তু আমি শিকার করতে পারি, ঘোড়া দৌড়াতে পারি বলে আমাকে দলের মধ্যে রেখেছে। মনে করেছে আমিও তাদের দলেরই একজন হয়ে গেছি।

মিঃ হ্যাডেনের মুখে হোসেন আলির কথা শুনিয়া অশোক ও দীপকের সব কথা মনে পড়িল, সত্যইত মেলাতে তাহাকে যেন কাহার সঙ্গে কথা বলিতে দেখিয়াছে। হায়রে পৃথিবী, এখানে সরলতা নাই, মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করিতে পারে না! এই হোসেন আলী তাহাদের সহিত এমন ভাবে প্রবঞ্চনা করিতে পারে এমন কথা তাহারা ভাবিতেও পারে নাই। কি কপট সে !

মিঃ হ্যাডেন বলিলেন—তোমাদের পরিচয় পেলাম। আমার পরিচয় শোন—আমার বাড়ী আমেরিকা,—নিউইয়র্ক—আমিও এসেছিলাম সাহারা মরুভূমি আর আফ্রিকার দেখ্‌বার যা কিছু সে সব দেখ্‌বার জন্য পর্যাটকরূপে, তখন জান্‌তাম না ত যে আমি এমন ভীষণ ফাঁদে এসে পড়্‌বো ! এই তিন বৎসর এই দুর্দ্দান্ত দস্যুদের সঙ্গে বাস করে—আমার জীবন দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠেছে। সে কথা বলে কোন লাভ নেই আর তোমাদের কাছে,—আজ হ'তে, আমি পণ করছি, আমরা সুখে-দুঃখে একসঙ্গে সময় কাটাবো, যদি মুক্ত হ'তে পারি, তবে একসঙ্গেই মুক্ত হ'ব, আর যদি বন্দী থাক্‌তে হয় একসঙ্গেই থাক্‌বো, মরতে হয়, একসঙ্গে মরবো। তারপর একটু এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া বলিলেন,—আমাদের বেশীক্ষণ একসঙ্গে থাকা ঠিক্ নয়, কি জানি আবার তুরেগেরা কোন সন্দেহ করে বসে।

এই কথা বলিয়া মিঃ হ্যাডেন চলিয়া গেলেন। অশোক ও দীপকের মনে বেশ আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইল।

তারপর কয়েকদিন বেশ নিরাপদে কাটিয়া গেল। তুরেগেরা প্রতিদিন আশা করিয়া থাকে এই বুঝি অশোক ও দীপকের মুক্তিকর সেই আশীটি বন্দুক আসিয়া পৌছিল। ইহারা বন্দুক ভালবাসে, শিকার ভালবাসে, তাই বন্দুকের আশায় তাহারা উৎফুল্ল। বন্দী বালকদের সঙ্গে বোধ হয় এই আশায়ই তারা বেশ ভাল ব্যবহার করিতে-ছিল। এমিনা আগেরই মত তাহাদের সহিত বন্ধুর মতো ব্যবহার করিত। এমনকি সর্দ্দারও যেন অনেকটা প্রসন্ন। অশোক ও দীপকের মনে শুধু এইটুকু দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে তুরেগদের তাহাদের প্রাণে মারিবার ইচ্ছা নাই, যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে সেই রাত্রিতে সেই ভাঙ্গা বাড়ীর কাছেই তাহাদের জীবন-নাশ করিতে পারিত।

অশোক ও দীপকের কাছে তাহাদের এই বন্দীদশা, এই নূতন অভিযান কিন্তু বেশ ভালই লাগিতেছিল। তাহাদের মনে হইতেছিল, তাহারা যে পৃথিবীর লোক এ যেন সে পৃথিবী নয়।

এখানে তাহারা দেখিত- প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সর্দ্দার তাঁহার শিবিরের দরজায় বসিয়া—যে কেহ পথ দিয়া যাইতেছে, তাহাকেই সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছে।

কোথাও কোন খর্জ্জুরকুঞ্জের আড়ালে কয়েকজন তুরেগ গল্প করিতেছে। আর সম্মুখে একটা কাৎলিতে কাফির জল গরম হইতেছে---কাৎলিটাকে নাড়া-চাড়া করিয়া বাষ্প কুণ্ডলি পাকাইয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে। কতকগুলি লোক উৎসুক নয়নে সেদিকে চাহিয়া আছে। কি তাদের বিকট চেহারা! উটের রোমের তৈরী লম্বা ঢিলা জামা, মাথায় বড় বড় পাগড়ী, কালো তীক্ষ্ণ চক্ষু! হাতের শিরাগুলি, মুখের বলিষ্ঠ আকৃতি অতি বড় সাহসী ব্যক্তির মনেও ভীতি জাগাইয়া দেয়।

ঐ দেখ আর একটি তাঁবুর পাশে, আগুন জ্বালাইয়া পাকা দাড়ি নাড়িয়া নাড়িয়া "কেশেগু"---(story-teller) কত গল্প বলিয়া যাইতেছে। হয়ত একই গল্প সে কমপক্ষে বিশ ত্রিশবার পর্য্যান্ত এই দুর্দ্দান্ত শ্রোতাদের কাছে বলিয়াছে। কতবার সে আরবদের শ্রেষ্ঠ বীর আঁতারের (Antar) গল্প বলিয়াছে, কেমন করিয়া আঁতার এক যুদ্ধে পাঁচহাজার সৈন্যকে বধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। কেমন করিয়া এক গভীর রাত্রিতে মরুভূমির বুকে একজন স্ত্রীলোকের করুণ মিনতি শুনিয়া তাঁহার ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়া সেই বিপন্না

নারীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন,—কি সে বীরত্ব,—কি সাহসিকতা! আরও কত বীরত্ব-কাহিনী!

কেশেগু বলিতেছিল—সুলতান সেদাদের কাহিনী! কত যে গল্প সে তাহার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে বলিতেছিল কে তা মনে করিয়া রাখিতে পারে! তারপর ক্রমশঃ

কেশেগু গল্প বলিয়া যাইতেছে

রাত্রি বাড়িতে থাকে। মরুভূমির বুকে শীত নামিয়া আসে। অতি উজ্জ্বল তারাগুলি ফুটিয়া উঠে! অবশেষে সব স্তব্ধ হইয়া যায় শীতের প্রকোপে। সুধু উটগুলি—ঘোড়াগুলি মাঝে মাঝে গা নাড়া-চাড়া করে, আগুনের দীপ্তি ক্ষীণভাবে ঝলসিতে থাকে। আর অটল অচল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে খেজুর গাছগুলি প্রহরীর মত!

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, তুরেগদের লোক ত্রিপলি হইতে আর ফিরিয়া আসিল না। সর্দ্দার অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। তাহার চোখে মুখে ব্যাকুলতা এবং ক্রুদ্ধ ভাব দেখা দিল। দলের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত ও দুর্দ্দান্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিবার ভাবটা বেশ সহজ ভাবেই প্রকাশ করিতে লাগিল।

একদিন সকাল বেলা মিঃ হ্যাডেন্ অশোক ও দীপককে বলিলেন—ব্যাপার বড় ভাল নয়, আমাদের এখন পালান ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই! বুঝতে পাচ্ছ ত অবস্থাটা—

অশোক চিন্তিত ও বিষণ্ণ মনে কহিল—কি বলুন ত?

জান ঐ যে শামার বলে লোকটা আছে, সে কি বলাবলি কচ্ছিল শুনেছ? সে বলছিল—নিশ্চয়ই ত্রিপলিতে আমাদের লোককে আটকে রেখেছে, নইলে সে এতদিনে কেন ফিরে আস্‌ছে না। নিশ্চয়ই তার কিছু বিপদ ঘটেছে। আমাদেরও এর প্রতিশোধ নেওয়া উচিত, এই ছেলে দু'টোকে মেরে।

এ কথা শুনিবা মাত্র অশোক ও দীপকের মুখ, ভয়ে ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল।

মিঃ হ্যাডেন্ বলিতে লাগিলেন—সর্দ্দার হুকুম দিয়েছে, শীঘ্র একদল তুরেগকে ঐ লোকটার সন্ধানে ত্রিপলির দিকে পাঠাবে। আমার মনে হয় যে যেমন ঐ দল বেরিয়ে যাবে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রাণও শেষ হবে।

অশোক ও দীপক করুণ-সুরে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিল—তবে উপায়! উপায়!—উপায় কি মিঃ হ্যাডেন্?

মিঃ হ্যাডেন্ গম্ভীর ভাবে বলিলেন—সে ভাবনা তোমরা করো না, সে ভার আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি সময়ে সে কথা তোমাদের জানাব, তোমরা কোন ভয় করো না। একজন আছেন আমাদের মাথার উপর—তাঁকে নির্ভর কর!

দুইদিন পরে সত্য সত্যই একদিন একদল তুরেগ মরুভূমির পথে অদৃশ্য হইল। সেই সঙ্গে এমিনাও চলিয়া গেল। ইহাতে অশোক ও দীপকের মন ভাঙ্গিয়া গেল। আর সেই দুর্দ্দান্ত রক্তপিপাসু শামার রহিল এই দলের মধ্যে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তুরেগ-দস্যুদের অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল

হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা দলবদ্ধ পর্য্যটকদিগের উপর অতর্কিত ভাবে আসিয়া আক্রমণ করিত। উহাদের উটগুলিও অতি দ্রুত চলিতে পারিত। এই উষ্ট্রদলের নাম 'মেহারী'। এইসব কারণে সে সময়ে তুরেগ-দস্যুদের হাতে পড়িলে প্রাণে-প্রাণে ফিরিয়া আসা ছিল অসম্ভব। মিঃ হ্যাডেন্ ইহাদের দলে থাকিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে ইহারা কিরূপ রক্তলোলুপ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির দুর্দ্ধর্ষ জাতি।

বেলা পড়িয়া আসিলে--সন্ধ্যা যেমন ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছিল, সে সময়ে দলের সকলে মিলিত হইয়া--ঐ অন্বেষণকারী দলকে বিদায় দিল। তাহারা চলিয়া গেলে পর দলের লোকেরা ফিরিয়া আসিয়া তাঁবুর ভিতর বা বাহিরের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরের মধ্যে না যাইয়া মুক্ত আকাশের তলে, উট, ঘোড়া প্রভৃতি জানোয়ারগুলির পাশে পাশে যে যেখানে পারিল, আস্তানা গাড়িল। সেদিন সন্ধ্যাটা ছিল—অসাধারণ গরম।

ধীরে ধীরে অন্ধকার আসিয়া চারিদিক ঢাকিয়া ফেলিল। অশোক ও দীপক দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়া সময় কাটাইতেছে, এমন সময় মিঃ হ্যাডেন্ দুই প্রস্থ তুরেগী জামা, কাপড় লইয়া সেখানে আসিলেন, মাথার পাগড়ীটি পর্য্যন্ত আনিতে তাঁহার ভুল হয় নাই। মিঃ হ্যাডেন্, চুপি চুপি বলিলেন—তোমরা তাড়াতাড়ি এই পোষাকগুলি পর। শেষে আমার সঙ্গে দরজার বাইরে এসে দেখা করো। আজ রাত্রিতেই আমাদের পালাতে হবে। বুঝ্‌লে—তৈরী হও।

তাঁহার কথা শুনিয়া অশোক ও দীপকের বুকের ভিতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠিতেছিল। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যদি পলাইতে না পারে, যদি ধরা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে কি যে তার পরিণাম।

এদিকে তুরেগেরা কাফি খাইবার জন্য আগুন জ্বালিয়াছে। কিন্তু সেই আলোতে অন্ধকার রাত্রির ভীষণ ভাবটা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। এই সুযোগে অশোক ও দীপক পোষাক পরিয়া একেবারে তুরেগ সাজিয়া দলে মিশিয়া গেল। কেহ তাহাদের দিকে এ সময়ে আর কোন লক্ষ্যই করে নাই।

সে রাত্রির কথা কি তাহাদের জীবনে কখনও ভুলিবার? সেই অন্ধকার রাত্রিতে---সেই অল্প আলো অন্ধকারের ভিতরে তুরেগদের শরীরের ছায়া দৈত্যদানার মত দেখাইতে-

ছিল। ক্রমে তুরেগদের খাওয়া দাওয়া শেষ হইল। তাহারা আবার একে একে সেই বৃদ্ধ কেশেগুর কাছে যাইয়া গল্প শুনিতে জড় হইল। আবার হাত নাড়িয়া নানারূপ মুখভঙ্গী করিয়া সেই বৃদ্ধ অশ্রান্ত ভাবে গল্পের পর গল্প বলিয়া যাইতে লাগিল এবং তাহারা শুনিতে লাগিল। মিঃ হ্যাডেন্ বৃদ্ধের নিকট হইতে দূরে এককোণে বসিয়া গল্প শুনিতেছিল। সম্মুখে আগেরি মত শিখা বিস্তার করিয়া আগুন জ্বলিতেছিল। এমন সময় মিঃ হ্যাডেন্ কৌশলে একটি থলি হইতে কতকগুলি বারুদ সেই আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন, সেদিকে কেহ লক্ষ্য করে নাই --কেন না তখন কেহ গল্প শুনিতে --কেহ বা বিশ্রাম করিতেছিল।

গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্ কি ভয়ানক শব্দ! চারিদিকে অগ্নিকণা ছিটাইয়া পড়িতে লাগিল, বজ্রের শব্দকেও হার মানাইয়া ভয়ানক শব্দের পর শব্দ হইতে লাগিল। এমন একটা আকস্মিক ঘটনায় তুরেগেরা মহা বিপন্ন হইয়া পড়িল, যে যেদিকে পারিল ছুটিতে লাগিল। কেহ বা কাহারও ঘাড়ে পড়িল, কেহ বা কাহাকেও জাপটাইয়া ধরিল--সকলের মুখেই আতঙ্কের একটা বিভীষিকাময় চিত্র ফুটিয়া উঠিল। চারিদিকে চীৎকার---আর্ত্তনাদ---হৈ-রৈ ব্যাপারে লোকগুলি প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এদিকে ঘোড়াগুলি--উটগুলিও ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে মরুপ্রান্তরের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

চারিদিকে— চীৎকার আর্ত্তনাদ হৈ-রৈ ব্যাপার—লোকগুলা প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল

তুরেগদের কাছে মরুভূমির দিকে ঘোড়া ও উট ছুটিয়া পালানো অত্যন্ত অমঙ্গলসূচক ব্যাপার। কাজেই তাহারা এই ঘটনাটাকে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

ঠিক্ এমনি সময়ে মিঃ হ্যাডেন্ আসিয়া অশোক ও দীপকের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন—আজ সারারাত কেন, কাল সারাদিন খুঁজে বেড়ালেও বাছাধনদের উট আর ঘোড়া ফিরিয়ে আনা সহজ হবে না। আর ততক্ষণে আমরা অনেক—অনেক দূর চলে যেতে পারবো।

তুরেগদের এই ব্যস্ততা ও ছুটাছুটির মধ্যে—তাহারা তিনজনে একটি দ্রুতগামী উটের পিঠে চড়িয়া— অন্ধকার রাত্রির ভীষণতার মধ্যে অসীম মরুপ্রান্তরের বুকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অষ্টম অধ্যায়

অজানা বিপদ

মরুভূমির পথে চলিতে চলিতে অশোক, মিঃ হ্যাডেন্‌কে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কেমন করে এ কাজটা করলেন বলুনত, মিঃ হ্যাডেন্?

মিঃ হ্যাডেন্ বলিলেন—কি করে করলেম জান? সব উট আর ঘোড়াগুলির দড়ি আমি খুলে রেখেছিলেম, সেজন্যেই ত ঐ উট আর ঘোড়াগুলি এমন করে ছুটে পালালো। সুধু আমরা যে উটটির পিঠে চড়ে পালাচ্ছি, তার বাঁধনটা শক্ত করে রেখেছিলুম, যেন পালাতে না পারে। এ উটটাকে তুরেগেরা নাম দিয়েছে—'হিরি'—মানে দ্রুতগামী উট। দেখ্‌ছ ত উটটা কেমন জোরে ছুটেছে। মিঃ হ্যাডেন্ বলিতে লাগিলেন যদি উটটা এই ভাবে ছুটে চলে তা হলে কাল সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ত্রিপলি পৌঁছতে পারবো। কিন্তু—

কিন্তু বলছেন কেন মিঃ হ্যাডেন্—তবে কি আমরা কাল সন্ধ্যার আগে ত্রিপলিতে পৌঁছতে পারবো না? দীপকের এই কথা শুনিয়া মিঃ হ্যাডেন্ বলিতে লাগিলেন—কেন

পারবো না, সে কথা তোমাদের বুঝিয়ে বল্‌ছি, প্রথমতঃ আমরা সোজাপথে যাচ্ছি না ; সোজাপথে গেলে, ধরা পড়বার সম্ভাবনা খুবই বেশী, একবার যদি ধরা পড়ি, তা হ'লে এরা টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেলবে,—মরুভূমির বালুতে আমাদের রক্তধারা মিশে যাবে। তারপর উটে চড়া ত আমাদের তেমন অভ্যাস নেই,—তোমাদের যে নেই, সে ত বেশ বুঝ্‌তেই পাচ্ছি। এজন্যই ঘুরা পথে বিপদের হাত এড়িয়ে তবে ত আমাদের চল্‌তে হবে।

মিঃ হ্যাডেনের কথাগুলি অতি সত্য। যাহারা কোনদিন মরুভূমিতে ভ্রমণ করেন নাই, তাহারা জানেন না যে মরুভূমিতে চলা কত বড় বিপদ ! এবং কত বড় কঠিন কাজ ! উটেদের গতি অসমান, একবার ডানদিকে দু'ফিট চলিল, আবার বাঁদিকে দু'ফিট চলিল,—এইরূপ দুলিয়া দুলিয়া চলার দরুণ, সমুদ্রের মধ্যে জাহাজে যেমন সামুদ্রিক-পীড়া জন্মে তেমনি মরুভূমির বুকে চলিবার সময় অনভ্যস্ত পথিকের—ঐরূপ পীড়া হয়, উটের ঐরূপ অসমান গতির জন্য।

—মিঃ হ্যাডেন্ বলিতে লাগিলেন,— আমরা সারারাত্রি আকাশের তারা দেখে পথ চলে পূব মুখে যাব। আর সকালের দিকে যেখানে প্রথম কূপ বা মরূদ্যান পাব সেখানেই বিশ্রাম করবো। এই ভাবে আমাদের চল্‌তে হবে, একথা যেন মনে থাকে।

কি এমন কষ্ট ? বাঙ্গালীর ছেলে তারা, সব রকম কষ্ট সহিয়াই ত জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, এই তাদের পণ, ক্ষুধা, শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে কেন তারা কাতর হইবে ? পৃথিবীতে এমন কি কঠিন কাজ থাকিতে পারে যে কাজ তাহারা করিতে পারিবে না ? কিন্তু অশোক ও দীপক শীঘ্রই বুঝিতে পারিল যে কল্পনা ও কাজে অনেক কিছু তফাৎ এই পৃথিবীতে আছে।

এই যাত্রাপথে কতকটা সময় তাহাদের একটা উত্তেজনার মধ্য দিয়া কাটিয়াছিল—মৃত্যুকে পশ্চাতে ফেলিয়া—বিশাল বিস্তৃত মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়া তাহারা গভীর নিশীথে পথ চলিয়াছে। মৃত্যুর হাত হইতে এই মুক্তিলাভের আনন্দে তাহাদের কাছে সমুদয় বাধা ও বিঘ্ন শারীরিক ক্লেশই অতি সামান্য—অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতেছিল। এখন তাহারা মুক্তিপথের পথিক, এখন স্বাধীনতা তাহারা ফিরিয়া পাইয়াছে, কাজেই শারীরিক ক্লেশ ও যাতনাকে বড় করিয়া দেখে নাই। কিন্তু ক্রমশঃ তাহারা তাহাদের পথের ক্লেশটা

অনুভব করিতে আরম্ভ করিল। অশোক ও দীপক দুইজনে পাশাপাশি উটের উপরকার কাঠের আসনটির দুইদিকে বসিয়াছিল। মিঃ হ্যাডেন্ বসিয়াছিলেন উটের কুঁজের কাছটায় —এমন ভাবে, যেন তিনি একখানি আরামকেদারার উপর পরম আরামে বসিয়াছেন আর কি!

তাহারা দুই ভাই বুঝিতে পারিয়াছিল যে এই পলায়নের পথে যত বাধা, বিপত্তিই এবং শারীরিক ক্লেশই তাহাদের সহিতে হউক না কেন,—পুরুষের মত (বালকের মত নয়!) তাহা সহিতেই হইবে।

মিঃ হ্যাডেন্ বারবার বলিতেছিলেন—হয় মৃত্যু—নইলে মুক্তি—এ দু'টিই সুধু এখন আমাদের সম্বল! তাহারা চলিতেছিল,—কি সে ভীষণ পথ, একবার কল্পনা করিয়া দেখ, অন্ধকার—চন্দ্র নাই—সে রাত্রিতে মরুভূমির বুকে আলো দিবে, সুধু তারাগুলি উজ্জ্বল নীলাকাশে জ্বলিতেছিল, সেই ক্ষীণালোকে বন্ধুর পথ তাহারা চলিতেছিল, কখন বালিয়াড়ির উপর, কখনও গভীর গর্ত্তে, আবার খানিকটা সমতল ভূমিতে এইভাবে চলিতে, তাহাদের কি যে যন্ত্রণা ও বেদনা হইতেছিল তাহা একবার ভাবিয়া লও।

তাহারা এখন অনেকটা নিরাপদ, এমন কথা বলা যাইতে পারে। সেই মরূদ্যান হইতে অনেকটা পথ চলিয়া আসিয়াছে। যদিই বা অনুসরণকারীরা তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াও থাকে তবু তাহারা যে পথে আসিয়াছে সে পথ চিনিবে কিরূপে? মরুভূমির বালুকারাশির গায়ে ত আর উটের পায়ের চিহ্ন থাকে না।

অশোক ও দীপক দেখিতেছিল, তাহাদের চারিদিকে বিস্তৃত বালুকা-সাগর। সে মরুভূমি অসীম ও অনন্ত। আকাশের কালো সীমান্ত রেখার সহিত কোথায় যাইয়া যে মিশিয়াছে কেই বা জানে! চারিদিকে কি গভীর স্তব্ধতা—কি গভীর নীরবতা! শব্দ নাই—বায়ুপ্রবাহ নাই—লোকজনের সাড়া নাই—গৃহপালিত পশুর শব্দ নাই—গাছের পাতার সর্ সর্ নাই—নিস্তব্ধ, নীরব ভীষণ স্তব্ধতা মরুভূমির দেশে বিরাজ করিতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে—সেই ঊষার আগমনীসূচক ক্ষীণ আলোকের প্রকাশের মধ্য দিয়া জনমানবের চিহ্নমাত্রও দেখা যাইতেছে না। সুধু তাহারা তিনজন আর তাহাদের বাহন উট ব্যতীত কোথাও কিছু নাই।

চলিতে চলিতে ক্রমশঃ ঊষার দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। ক্রমশঃ আলো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সবিস্ময়ে তাহারা দেখিতে পাইল দূরে এক ভীষণ দর্শন মূর্ত্তি !

অতি দূরে দেখা গেল, যেন একটা ভীষণ দৈত্য অতি দ্রুত তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে ! আকাশের গায়ে তাহার মাথা ঠেকিয়াছে আর শরীরটা তার মাটিতে আসিয়া মিশিয়াছে। এই সে আসিয়া পড়িল ছায়ার ভিতর দিয়া,—ক্রমশঃ এই ভীষণ দর্শন মূর্ত্তি কাছে আসিতেছিল। যেমন সে ঐ ছায়ালোকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন দেখা গেল যে এই দৈত্যের মত আকারের মানুষটার কাছে, অতি বড় যে দীর্ঘাকৃতি মানব—সেও বামনের মত খাটো হইয়া পড়ে। আফ্রিকার প্রকাণ্ডাকার হস্তীও খেলার পুতুলের মত মনে হইবে। —অশোক ও দীপক ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়াছিল। কিন্তু মিঃ হ্যাডেন্ শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন—অদ্ভুত দৃশ্য নয় কি ? আমার কাছে এ সব দৃশ্য নূতন নয় ! প্রথমবার যখন দেখেছিলাম, তখন আমিও তোমাদের মত ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম ! —অই যে দৈত্য দেখছো—কাছে এলে দেখ্তে পাবে আমাদেরই মত ছোট খাট একজন স্বাভাবিক মানুষ।

মিঃ হ্যাডেন্ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই সত্য। দৈত্য যতই কাছে আসিতে লাগিল, ততই তাহার আকার যেন ছোট হইয়া যাইতে লাগিল, অবশেষে একেবারে কাছে আসিলে দেখা গেল একজন সাধারণ আরব, একটা উটের পিঠে চড়িয়া যাইতেছে ! মরুযাত্রীরা পরস্পরে পরস্পরকে যেমন জিজ্ঞাসা করে, তেমনি ভাবে মরুযাত্রী আরব, ইহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল—আপনাদের শান্তি হউক। মিঃ হ্যাডেন্ও প্রত্যুত্তরে বলিলেন—আপনার শান্তি হউক।

মুহূর্ত্তমধ্যে মরুপথে এই নবীন যাত্রী দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেল।

এখন চারিদিকে আলোক প্রকাশ পাইয়াছে। মিঃ হ্যাডেন্ উটের গতি মন্থর করিয়া দিলেন—সাধারণ চলার মত উটটা চলিতে লাগিল। মিঃ হ্যাডেন্ দেখিয়া লইলেন যে তাহাদের বন্দুক, অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম, খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ সব ঠিক্ আছে কিনা ! যে তিনটি বন্দুক মিঃ হ্যাডেন্ উটের গলায় দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই বন্দুক তিনটি তেমনি আছে। তেমনি গুলি বারুদও ঠিক্ই রহিয়াছে। তবে যে থলিটির ভিতর

বারুদ ছিল চলার সময় অনবরত নড়াচড়ার দরুণ তাহা হইতে অনেকটা বারুদ পড়িয়া গিয়াছে।

মিঃ হ্যাডেন্ কথাটা গোপন করিয়াই যাইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু অশোক ও দীপকের নজর সেদিকে পড়িয়াছে, দেখিতে পাইয়া একটু শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন-- কোন উপায় নেই অশোক,—কোন উপায় নেই দীপক। যাক্ কোনরূপে যাওয়া যাবে, এখন খাওয়ার জিনিষ মিললেই হয়, —জল সে প্রচুর পরিমাণে আছে। জান দু'একদিন না খেয়েও বাঁচা যায়, কিন্তু এইমরুভূমিতে জল না হ'লে একদিনও চলে না বুঝলে--

মিঃ হ্যাডেনের কথাটা শেষ হইতে না হইতেই দীপক হঠাৎ খুব আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—ঐ যে দূরে আকাশের গায়ে তিনটি খেজুর গাছ দেখা যাচ্ছে। অশোকও সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, —তাইত কি আশ্চর্য্য! তিনটে খেজুর গাছ উল্টোভাবে শূন্যে ঝুল্‌ছে!

মিঃ হ্যাডেন্ তাহাদের কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন মাত্র! তারপর বলিলেন---তা হ'লে আমাদের বিপদ কেটে আস্‌ছে বল্‌তে পার, খেজুর গাছের ছায়া যখন আকাশে দেখ্‌তে পেয়েছ, তখন কিছুদূরে একটা মরূদ্যান মিল্‌বে নিশ্চয়ই! তা হলেই জলের অভাব ঘুচ্‌বে!

তাঁহার কথা সত্য হইল। তাহারা যখন একটু পরেই একটা কূপের কাছে আসিল, তখন দেখিতে পাইল যে সেখানে তিনটি খেজুর গাছ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহার কাছেই একটা কূপ রহিয়াছে।

কূপটা দেখিয়া তাহারা আশ্বস্ত হইল, কিন্তু হায়রে মানুষের আশা! কূয়োটার ভিতর জল ছিল অপর্য্যাপ্ত কিন্তু ঘন ও কর্দ্দমাক্ত- পানের অযোগ্য। খেজুর গাছে একটিও খেজুর ছিল না, বোধ হয় পূর্ব্বগামী কোন মরুযাত্রী এই পথে যাইবার সময় এখানকার জল দূষিত এবং খেজুর গাছের যা কিছু খেজুর ছিল তাহা খাইয়া নিঃশেষ করিয়া গিয়াছে।

দুঃখ করিয়া ত কোন ফল নাই! তাহাদের সঙ্গে যা কিছু সামান্য সম্বল ছিল, তাহা দিয়াই কোনরূপে খাওয়া শেষ করিল।

ক্রমে সূর্য্য প্রখর হইয়া উঠিল। মরুভূমির সূর্য্য, কি তার প্রচণ্ড তেজ, কি তার

কিরণ-দীপ্তি। মিঃ হ্যাডেন্ বলিলেন—চল আমরা এখনই আবার যাত্রা সুরু করি, আমাদের যে সম্মুখে রহিয়াছে অফুরন্ত পথ, তারপর দিন যেমন বাড়তে থাকবে, সূর্য্যের তেজ এমন প্রখর হয়ে উঠ্‌বে যে যাত্রা অসম্ভব হয়ে উঠবে। এদিকে খাদ্যেরও যে কতটা অভাব তাত দেখ্‌তেই পাচ্ছ।

এ সময়ে অশোক ও দীপক খর্জ্জুরকুঞ্জের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল।

একটু পরে তাহারা দেখিতে পাইল যে কতকগুলি উটপাখী (ostrich) বিস্তৃত মরুপ্রান্তরে বিচরণ করিতেছে! উটপাখী কয়টিকে দেখিয়া মিঃ হ্যাডেন্ তাড়াতাড়ি মাটিতে শুইয়া পড়িয়া সেদিকে বন্দুকের তাগ্ ঠিক্ করিতেছিলেন। খেজুর গাছের ছায়ায় এমন ভাবে শুইয়া পড়িয়াছিলেন যে উটপাখীগুলির দেখিতে পাওয়ার কোনও সম্ভবনা ছিল না।

পাখীগুলি ক্রমশঃই কাছে আসিতে লাগিল—মিঃ হ্যাডেন্ কোন্‌টিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িবেন তাহাই ভাবিতেছিলেন—ঠিক্ এমন সময় দেখা গেল যে সম্মুখের একটা উটপাখী মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে। আবার একটু পরেই আর একটা উটপাখীও মাটিতে মৃত অবস্থায় পড়িয়া গেল। কি ভাবে এই উটপাখী ছ'টি মরিল তাহা আশ্চর্য্য বটে!

অশোক ও দীপক ভয়ে ও বিস্ময়ে আশ্চর্য্য হইয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে তাহারা বিস্মিত হইয়া দেখিতে পাইল যে অন্য সব পাখীগুলি যখন মরুপ্রান্তরে অদৃশ্য হইয়াছে, তখন একটা পাখী যেন হঠাৎ একজন দীর্ঘাকার মানুষ হইয়া দাঁড়াইল। পাখীর কোন চিহ্নই রহিল না।

দীপক কহিল, লোকটা কি সত্য সত্যই উটপাখী হয়ে গিয়েছিল নাকি?

মিঃ হ্যাডেন্ বলিলেন,—দক্ষিণ আফ্রিকার "হোটেনটোটেরা" এই ভাবে উটপাখী শিকার করে। উটপাখীর পালক পরে—মুখোশ পরে উটপাখীর দলে মিশে যায়, তারপর বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে পাখী মারে। এই আরবও ঠিক্ সেই কৌশল অবলম্বন করেই ছ'টি পাখী মারল।

এদিকে সেই আরবটি মৃত উটপাখী ছ'টির শরীর হইতে তাহাদের পালকগুলি সযত্নে তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ-পূর্বদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। মিঃ হ্যাডেন্ বলিলেন—ত্রিপলির

বাজারে এই পাখীর পালকের দাম খুব বেশী। সেখান হইতে ইউরোপ আমেরিকাতে এই পাখীর পালক চালান দেওয়া হয়। তবে লোকটি আমাদের একটা উপকার করে গেল,—আমাদের খাবার ব্যবস্থা করে গেল। বেশ টাট্‌কা মাংসের যোগাড় হল। তোমরা এখানে একটু বস, আমি মাংস নিয়ে আস্‌ছি।

অশোক কহিল, আপনি এইমাত্র বললেন যে এরা বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে পাখী মারে। তবে মিঃ হ্যাডেন্ বলিলেন—সেজন্য ভেবো না,—এ বিষ এখুনি সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়েনি। আর আমরা বেশ করে আগুনে ঝলসিয়ে নিয়ে খাব, কোন ভাবনা নেই তোমাদের

একটা পাখী হঠাৎ মানুষ হইয়া দাঁড়াইল

একথা বলিয়া মিঃ হ্যাডেন্ তাড়াতাড়ি উটপাখী দুইটির কাছে গিয়া পায়ের দিক্‌কার মাংসের ফালি লইয়া আসিয়া খেজুর গাছের নীচে শুক্‌নো পাতা ও ডাল-পালা জড় করিয়া আগুন জ্বালিয়া কতকটা রান্না করিয়া খাইল আর বাকী কতকটা অংশ খেজুর পাতায় জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিয়া দিল, যেন বেশ টাট্‌কা থাকে।

তাহাদের এইভাবে খাওয়া দাওয়া করিতে করিতে অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। এদিকে বেলা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। মরুপ্রান্তর যেন অগ্নিপ্রান্তরে পরিণত হইয়াছিল। এখন শীত কাল। সাহারার মরুভূমিতে শীত ঋতুতেও কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না।

তাহারা যখন ঐ আশ্রয়স্থান পরিত্যাগ করিল, তখন মরুপ্রান্তরের অবস্থা অতি ভীষণাকার ধারণ করিয়াছিল,--

কেবল অনল ভার বহে সমীরণ
দিনকর প্রাণহর বেশ,
বালির তুফান উঠে ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটে
প্রাণিশূন্য তবু যেন সদা হাহাকার।
ধূ-ধূ-ধূ-ধূ-ধূ-ধূ করে দূর চক্র সীমা তার
ভীষণ—ভীষণ মূর্ত্তি মরু সাহারার !

এইভাবে ভীষণ ক্লেশ সহিয়া চলিতে চলিতে তাহারা আর একটি কূপ সন্নিকটে আসিয়া পৌঁছিল, তখন দেখিল যে কাহারা যেন এই কূপটির মুখও বন্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখানে অনেকগুলি খেজুর গাছ একসঙ্গে থাকায় স্থানটিকে ছায়া-শীতল করিয়া রাখিয়াছিল। মিঃ হ্যাডেন্ তাড়াতাড়ি গাছের ছায়ায় শুইয়া পড়িয়া বলিলেন—এখানে খানিকটা সময় বিশ্রাম করা যাক্ তারপর যাত্রা করা যাবে।

অশোক ও দীপক মিঃ হ্যাডেনের ন্যায় পরমানন্দে সেখানে শুইয়া পড়িল। তাহারা যেন এইরূপ বিশ্রামে তাহাদের জীবন ফিরিয়া পাইয়াছিল। এখানে তাহারা এক ঘণ্টারও উপর বিশ্রাম করিল, কাহারও মুখে একটা কথা নাই। কি আর তাহাদের কথাই বা থাকিতে পারে। সুধু একই ভাবনা—একই চিন্তা তাহাদের মনের মধ্যে জাগিয়াছিল, —সে সুধু নিরাপদ মুক্তির কথা, আর কিছু নয়।

বেলা পড়িয়া আসিলে সূর্য্যের প্রখরতা যখন অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল, তখন তাহারা তিনজনে আবার যাত্রা আরম্ভ করিল—সেই তাদের অনন্ত মরুযাত্রা !

উটটা কতকটা পথ চলিয়াই গলা বাড়াইয়া কিসের যেন সন্ধান করিতেছিল ! আর তার গতিটা বেশ বাড়াইয়া দিয়াছিল।

মিঃ হ্যাডেন্ বলিলেন—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ! কাছেই জল আছে—উট বুঝ্তে পেরেছে।

একটা ঢালু বালিয়াড়ির আড়ালে দেখা গেল সুন্দর একটি মরূদ্যান। রীতিমত

খর্জ্জুর বন বলিলেই হয়, আর তাহার মাঝখানে গাছের ছায়ায় একটি বৃহৎ কূপ রহিয়াছে। তাহারা উহা দেখিতে পাইয়া উটটাকে জোরে চালাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। উটটা চলিতে চলিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল—আর কিসের যেন অজানিত ভয়ে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

মিঃ হ্যাডেন্—ভীত হইয়া বলিলেন—নিশ্চয়ই কোন বিপদ উপস্থিত! নইলে উটটা এমন করে কাঁপবে কেন বল ত? এই কথা বলিয়া তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিক লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়িল কূপটার সম্মুখে খেজুর গাছের ছায়ায় একটা প্রকাণ্ড সিংহ, লম্বালম্বি ভাবে শুইয়া রহিয়াছে। বাতাসে তাহার মাথার কেশরগুলি দুলিতেছে।

—

নবম অধ্যায়

সিমুম

সত্যই কি সিংহটা ঘুমিয়ে আছে?

হাঁ, দেখে মনে হচ্চে যে সত্যই সিংহটা ঘুমিয়ে আছে। সিংহটা একেবারে স্তব্ধ-ভাবে পড়িয়াছিল, নড়া চড়া কিছুই করিতেছিল না। যদি সিংহটা জাগিয়া থাকিত তাহা হইলে উটটাকে দেখিয়া, লোকজন দেখিয়া নিশ্চয়ই একটা ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিত! কিন্তু কৈ, তাহার কিছুই ত করিতেছে না! কিন্তু আশঙ্কার কারণও বড় কম নয় কাছে গেলে হঠাৎ হয়ত সিংহটা জাগিয়া উঠিয়া ভীষণ গর্জ্জনে সকলকে আক্রমণ করিবে!

কি করা যায়? এ হইল একটা বিষম সমস্যা! তাহারা যে ভাবে চুপ্‌চাপ্‌ রহিয়াছে সেখানে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি পিপাসায় মারা যাইবে?—না সম্মুখে যাইয়া—এই ভীষণাকৃতি সিংহের কবলে পড়িবে? সত্যই একটা সমস্যা হইয়া

দাঁড়াইল ! এমন কি মিঃ হ্যাডেনের মত সাহসী পুরুষও কিছুকালের জন্য কি করিবেন, তাহা ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না,—তিনি ত তাঁহার এই মরু-জীবনে কতবার সিংহ শিকার করিয়াছেন—কতবার সিংহের মুখে বিপন্ন হইয়াছেন, তিনি জানেন যে সিংহ যদি একবার আহত হয় তাহা হইলে অতি ভীষণ হইয়া উঠে। অল্পক্ষণ পরেই মিঃ হ্যাডেন্ তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন এবং সিংহটার সম্মুখীন হওয়াই সঙ্কল্প করিলেন। মিঃ হ্যাডেন্ বলিলেন, —শোন, অশোক, দীপক,—আমাদের জল চাই-ই-চাই, আর একবার দেখা যাক্—সিংহটা কি ভাবে আছে। আমি এখান থেকে ত আর সিংহটাকে গুলি করতে পারবো না ! কাজেই আমার আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে কাছাকাছি যেতে হ'বে। যদি আমি সিংহটার হাতে মারা যাই,—তা হলে তোমরা বরাবর উত্তর-পশ্চিম মুখে অগ্রসর হবে। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করবেন !

অশোক এবং দীপকও কিন্তু বন্দুক হু'টি হাতে লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তিনি হাত দিয়া ইসারা করিয়া তাহাদিগকে তাঁহার অনুসরণ করিতে মানা করিলেন। তিনি এ সময়ে বালিয়াড়ির দিকে হামাগুড়ি দিতে দিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। উটটা এতক্ষণ পর্য্যন্ত বেশ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আবার সে ভয়ে কাঁপিতে আরম্ভ করিল। তারপর ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বালুর ভিতর মাথা গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল !

এইবার অশোক ও দীপকের মনে তেমন ভয় হয় নাই এবং তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে এ সিংহের ভয়ে উটটি এইরূপ ভাবে কাঁপিতেছে না। তবে কি আবার আর একটা সিংহ আসিতেছে নাকি ? সিংহের ভয়ে উটটা কখনও শুইয়া পড়িত না— সটান ছুট্ দিত ! কিন্তু তাহা না করিয়া শুইয়া পড়িল কেন ?

মিঃ হ্যাডেন্ও ইহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি উটটিকে শুইয়া পড়িতে দেখিয়া সেই মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়া বেগে অশোক ও দীপকের কাছে ছুটিয়া আসিলেন এবং ভগ্ন ও জড়িত স্বরে বলিলেন—সর্ব্বনাশ ! যদি বাঁচ্‌তে চাও, তবে এখুনি বালিতে শুয়ে পড়, মুখ ঢেকে ফেল ! তিনি পাগলের মত বলিতে লাগিলেন—ঐ দেখ সিমুম ছুটে আস্‌ছে ! সিমুম ছুটে আস্‌ছে।

আর একটী কথা বলিবারও অবসর ছিল না। বিদ্যুতের মত বেগে সিমুম ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সে কি ভীষণ বালুর ঝড়—সে যেন বালুর বন্যা! আকাশে বাতাসে বালুর লোফালুফি, শত সহস্র বালুর তৈরী আকাশ ছোঁয়া থাম—দৈত্যের হাতের দণ্ডের মত বেগে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। তাহারা এই সিমুমের কথা বহিতে পড়িয়াছে এবং লোকের মুখে শুনিয়াছে, আজ সেই সিমুম প্রত্যক্ষ করিল।

তাহারা তিনজনে উটটির পাশে সারা শরীর ঢাকিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। দূর হইতে ভীষণ শব্দ করিতে করিতে আকাশ ও পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া—একি এ প্রলয়ের ঝড় বহিতেছিল! কোথায় সূর্য্য, কোথায় আলো, চারিদিকে বালুকারাশি বিস্তৃত হইয়া প্রলয়ের অন্ধকার আনিয়া দিয়াছিল। ঝড়ের বেগে মনে হইতেছিল যে বাতাস বুঝি তাহাদিগকে আকাশে উড়াইয়া নিবে। কিসের যেন একটা উষ্ণ হাহাকার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল।

তাহারা কতক্ষণ এইভাবে শুইয়াছিল, তাহা নিজেরাই বুঝিতে পারে নাই। কতক্ষণ তাহারা শুইয়াছিল? এক ঘণ্টা? একদিন? কি এক সপ্তাহ? সে তাহারা বলিতে পারে না! অনেক পরে অশোক অনুভব করিল যে উটটা তাহার ডানপাটা তাহার কাঁধের কাছ হইতে সরাইয়া লইয়া যেন গা ঝাড়া দিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল! —এইবার মিঃ হ্যাডেনের স্বর শোনা গেল! তিনি প্রফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন—এইবার উঠ তোমরা, বিপদ কেটে গেছে—সব আবার পরিষ্কার হয়ে গেছে!

অশোক ও দীপক তাহাদের গাত্রাবরণী ফেলিয়া দিয়া মিঃ হ্যাডেনের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

সাহারার ভীষণ সিমুম ঝড়ে পড়িয়া তাহারা এতদূর বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল যে বড় বিপদের কাছে, ছোট বিপদের কথা আর মনেই ছিল না! —এখন আবার হঠাৎ তাহাদের সিংহের কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহারা সিংহটা যে দিকে ছিল সে দিকে তাকাইয়া দেখিল যে—তাহাদের কাছ হইতে অল্প দূরে সেই সিংহটি হাত পা ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। তাহার থাবা খোলা পড়িয়া আছে, মুখটা বিস্তৃত, দাঁতগুলি দেখা যাইতেছে!

দীপক সিংহটার দিকে অপলকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, তবে কি সিংহটা মড়া ?

মিঃ হ্যাডেন্ ধীর ভাবে বলিলেন—অচল পাথরের মত সিংহটা মরে রয়েছে,—আমরা যদি সারা শরীর ও মুখ ঢেকে শুয়ে না পড়তাম, তা হ'লে আমাদেরও ঐ অবস্থাই হ'ত ! বেচারা সিংহ এই কৌশলটা জান্‌ত না, তাই সিমুম ঝড়ে পড়ে প্রাণ হারালো।

এইবার তাহারা তিনজনে কূপের কাছে গেল। এই কূপের জল স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। তিন জনে সেই জল পান করিয়া যেন পুনর্জ্জীবন লাভ করিল। তাহাদের শিরায় শিরায় নূতন জীবনী-শক্তি প্রবাহিত হইল।

মিঃ হ্যাডেন্ বলিলেন—এবার কিছু খেয়ে দেয়ে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্ ! তারপর আবার রওয়ানা হ'ব !

অশোক ও দীপক দেখিল এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে মিঃ হ্যাডেন্ খেজুর গাছের তলায় কি যেন একটা জিনিষের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছেন। সেখানে বালির মধ্যে একটা মানুষের মাথার খুলি, কয়েকখানি মানুষের হাড়—আর কি যেন একটা জিনিষ ঝল্‌মল্ করিয়া জ্বলিতেছিল ! মিঃ হ্যাডেন্ বালুর মধ্য হইতে তাড়াতাড়ি সেই জ্বল জ্বলে জিনিষটি হাতে তুলিয়া লইলেন !—বেশী কিছু নয় একটা রূপার মাদুলি মাত্র ! মিঃ হ্যাডেন্ খানিকক্ষণ রূপার মাদুলিটার দিকে দেখিয়া বলিলেন, এই রূপার মাদুলিটা আমি বরাবর সে লোকটার গলায় দেখেছি ! শুন্‌ছো অশোক, শুন্‌ছো দীপক—সর্দ্দারের লোকটা যে ত্রিপলি কেন পৌছতে পারেনি এখন তার কারণ বোঝা গেল ! এই লোকটাকে আমাদের সর্দ্দার ত্রিপলিতে তোমাদের সেই চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিল। কি যে তার পরিণাম হয়েছে, তা ত চোখের সাম্‌নেই দেখ্‌তে পাচ্ছ !

দীপক বলিল—তবে কি এই লোকটা সিংহের মুখে প্রাণ হারিয়েছে ? মিঃ হ্যাডেন্ বলিলেন, আমার ত তাই মনে হয়, ভয় নেই আমাদের আর সিংহের মুখে পড়বার আশঙ্কা নেই ! যাক্ সে সব কথা, এস এখন আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে খাওয়া দাওয়া করি।

মিঃ হ্যাডেন্‌কে বলা যেতে পারে লোহার তৈরী মানুষ। এত বড় বিপদ-আপদের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাকে বিচলিত হ'তে দেখা যায় নাই। এতটা যে ঘটিয়া গেল,

তাহাতে মিঃ হ্যাডেন্ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে খাইতে আরম্ভ করিলেন। অশোক ও দীপক কিন্তু হৃদয়ের বল অনেকটা হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহারা পূর্ব্বের মত যেন মনকে সরস ও সবল করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না, তাহারা কতকটা যেন অনিচ্ছার সহিত খাওয়া দাওয়া করিল। তারপর ঠিক হইল যে সে রাতটা তাহারা এই মরূদ্যানেই কাটাইয়া দিবে।

তার গলায় এ মাদুলি আমি বরাবর দেখেছি

সেকালের রাজপুত্র, উজীরের পুত্র, কোটালের পুত্র যেমন প্রহরের পর প্রহর জাগিয়া ভ্রমণ-পথে রাত্রি অতিবাহিত করিত, সেইরূপ তাহারা তিনজনেও প্রহরে প্রহরে জাগিয়া প্রহরা দিয়া রাত্রি কাটাইবে স্থির করিল! এইভাবে সে রাত্রি কাটাইয়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহারা যাত্রা আরম্ভ করিল।

মিঃ হ্যাডেন্ বলিলেন—এই সিংহটা কিন্তু আমাদের শুভ সংবাদ বহন করে এনেছে!

দীপক কৌতূহলি হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কি রকম?

রকম আর কিছুই নয়. এখন বোঝা যাচ্ছে যে আমরা ক্রমশঃ গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছি! সিংহেরা রাত্রিবেলা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে বেড়ায় বটে তবে তারা সচরাচর গ্রামের কাছাকাছি বাস করে, নইলে শিকার জুটবে কোথায়? গরু, ঘোড়া, হরিণ এ সব খেয়ে তারা বাঁচে ত! আমার মনে হয় আমরা ত্রিপলির সীমার কাছাকাছি

এসেছি ! আজ রাত্রিতে শোবার সময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, যেন তাঁর অসীম দয়ায় আমরা নিরাপদে ত্রিপলি পৌঁছতে পারি।

অশোক ও দীপক তাঁহার কথায় প্রীতমনে সম্মত হইল।

দীর্ঘ সময় বিশ্রাম, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল পান, আর সকলের উপর আবার সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবে স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবার প্রত্যাশায় তাহাদের মনে নবীন উৎসাহ ও প্রেরণা জাগিয়া উঠিয়াছিল। আবার এ কয়দিনে উটের পিঠে চড়িতে চড়িতে এখন তাহারা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আর তেমন কষ্ট বোধ হইত না। আবার অনবরত শারীরিক ব্যায়াম, মরুভূমির শুষ্ক ও নির্ম্মল বায়ু সেবনে তাহাদের দেহ বেশ মজবুত ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল।

জ্যোস্নারাত্রির অপূর্ব্ব শোভা ও সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া কত রাত্রি তাহারা মরুভূমির পথে চলিয়াছে। উপরে উদার অনন্ত নীল আকাশ, চন্দ্রের কিরণধারা বালুকাসাগরের গায়ে গায়ে ঘুমাইয়া পড়িয়া আছে, তারা জ্বলিতেছে—বায়ুপ্রবাহ বেগে বহিতেছে, আর তাহারা তিনজন বিজন পথের যাত্রী, এ যেন জগতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যান্ত চিরদিনেব চিরযাত্রা ! সে যাত্রার যেন আর শেষ নাই !

এতদিনে—বুঝি এতদিনে এই অসীমের পথে যাত্রার শেষ হইয়া আসিতেছিল। অশোক ও দীপক শীঘ্রই বুঝিতে পারিল যে মিঃ হ্যাডেনের অনুমান সত্য। সত্য সত্যই তাহারা মানুষের বাসভূমির কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণে ও বামে তরুশ্রেণী দেখা যাইতে লাগিল, প্রথমে দুই একটি বিচ্ছিন্ন তরুকুঞ্জ, তারপর ক্রমশঃই তাহারা ঘন হইয়া আসিতে লাগিল। সকালের দিকে তাহারা দেখিতে পাইল দূরে কতকগুলি তাঁবু রহিয়াছে। দূর হইতে সেগুলি কালো কালো দেখাইতেছিল ! এইভাবে একটির পর একটি করিয়া অনেকগুলি তাঁবুর সারি তাহারা এপাশে ওপাশে চারিদিকে দেখিতে পাইল ! তাহারা ক্রমশঃই মানুষের বসতির চিহ্ন সব দেখিতে পাইল।

নানা রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া সূর্য্য যখন পূর্ব্বদিকে দেখা দিলেন, তখন তাহারা দেখিতে পাইল, দূর হইতে উষ্ট্রযূথ, অশ্বশ্রেণী এবং অনেকগুলি মানুষ পায়ে হাঁটিয়া হাঁটিয়া উত্তর-পূর্ব্বদিক হইতে তাহাদের দিকে চলিয়া আসিতেছে !

মিঃ হ্যাডেন্ অশোক ও দীপকের দৃষ্টি সে দিকে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন,—ঐ লোকগুলো দেখে তোমাদের কি মনে হচ্চে ? আমরা সাম্‌নের ঐ মরূদ্যান হ'তে কিছু জল সংগ্রহ করে আবার পথ চলা সুরু করবো, তুরেগ-দস্যুদের এলাকা হ'তে যতটা এগিয়ে যেতে পারি ততই মঙ্গল, কি বল ?

অশোক ও দীপক তাঁহার কথায় সম্মতি দিল। তাহারাও ত্রিপলি পৌঁছিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল ! তাহাদের কাছে প্রত্যেকটি মিনিট মনে হইতেছিল যেন এক একটি ঘণ্টা। কাজেই তাহারা কাছাকাছি যে মরূদ্যানটা পাইল, সেখানকার কূপ হইতে জল পানে তৃষ্ণা দূর করিয়া এবং কতকটা জল সংগ্রহ করিয়া আবার যাত্রা সুরু করিল।

উটটিও দীর্ঘকাল বিশ্রাম করিতে পাইয়া যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। এই নিরীহ প্রাণীটিও দ্রুতগমনে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুলিতেছিল।

এমন সময়ে দূরে নীল আকাশের গায়ে নীল রেখার মত ঘরিয়ান্ পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। মিঃ হ্যাডেন্ সেই পর্ব্বতশ্রেণী দেখাইয়া বলিলেন—দেখ আমরা যদি একবার ঐ পর্ব্বতশ্রেণীর কাছাকাছি যেয়ে পৌঁছিতে পারি তবে সম্পূর্ণ নিরাপদ হতে পারবো।

অশোক ও দীপক একসঙ্গে আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিল—বাঃ কি মজা ! তা হ'লে আজ রাত্তিরেই আমরা ত্রিপলি গিয়ে পৌঁছব।

মিঃ হ্যাডেন্ গম্ভীর ভাবে বলিলেন—অতটা আশা করা ঠিক্ নয় ! তবে যে করেই হ'ক, যদি পথে আর কোন বিঘ্ন বিপদ না ঘটে, তা হ'লে ঐ পর্ব্বতশ্রেণীর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছতে হবেই !

মানুষ জানে না, কখন কি ভাবে বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয় ! কেমন করিয়া আশার স্বপ্ন শূন্যে মিলাইয়া যায় ! হায়রে মানুষের জীবন, কতটুকুই না তার আশা ও আকাঙ্ক্ষা জীবনে সফল হইয়া উঠে !

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন প্রখরতা বাড়িতেছিল, ঠিক্ তেমনি সময়ে তাহারা আর একটি ক্ষুদ্র মরূদ্যানের কাছে যাইয়া পৌঁছিল। এখানে তাহারা বেশ পেট ভরিয়া খাওয়া

দাওয়া করিল এবং সুমি জল পানষ্ট করিয়া সজীবতা লাভ করিল। অশোক ও দীপকের মনে আর আনন্দ ধরেনা, এইবার তাহাদের যাত্রা শেষ - এইবার তাহারা স্বাধীন, এইবার তাহারা মুক্ত ও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ভাবে ত্রিপলি পৌঁছিতে পারিবে! তাহারা যখন এইরূপ ভাবে আনন্দে বিভোর, এমন সময় দেখা গেল যে একদল তুরেগ এই কূপের দিকে আসিতেছে!

অশোক ও দীপকের প্রফুল্ল মুখ মেঘের মত মলিন হইয়া গেল। মিঃ হ্যাডেন্ও বিমর্ষ এবং চিন্তান্বিত হইলেন। হয়ত বা এই তুরেগেরা অন্য দলভুক্ত, তবু কেমন তাহার মনে হইতেছিল, না—না—এরা নিশ্চয়ই বন্ধু নয়! যদি ইহারা শত্রু হয়, তবে কি যে ভীষণ বিপদ তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে, একদিকে মাত্র তিনজন লোক, তার মধ্যেও তুইজন বালক, আর অন্য পক্ষে বলিষ্ঠ তুরেগ-দস্যুর দল।

কাছে আরও কাছে ক্রমশঃ অতি কাছাকাছি সেই তুরেগ অশ্বারোহীদল আসিয়া পৌঁছিল! সম্মুখের কতকগুলি অশ্বারোহীর মাথায় রক্তাক্ত পটি বাঁধা এবং গায়ের জামায় রক্তচিহ্ন দেখা গেল। মনে হইল যেন কোথাও কোন একটা যুদ্ধে তাহারা আহত হইয়াছে। ---মিঃ হ্যাডেন্ অপলকনয়নে এই অশ্বারোহীদিকের দিকে তাকাইয়াছিলেন। হঠাৎ তাহার মুখ একেবারে বিবর্ণ ও বিমর্ষ হইয়া গেল! মনে হইল কে যেন মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মুখ হইতে সবটা রক্ত চুপ্ষিয়া লইয়াছে।

ভয়ে বিকৃতকণ্ঠে অশোক মিঃ হ্যাডেন্কে জিজ্ঞাসা করিল,—একি! আপনি এমন কচ্ছেন কেন? কি হয়েছে বলুন না?

মিঃ হ্যাডেন্ ভগ্নস্বরে চুপি চুপি বলিলেন—সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ হয়েছে, আর উপায় নেই, আমরা ধরা পড়েছি এইবার! ত্রিপলিতে যে লোকটাকে পাঠান হয়েছিল তাহার অনুসন্ধানে সর্দ্দার যে তুরেগদের পাঠিয়েছিল—এই সেই তুরেগ-দস্যুদল · এই সেই তুরেগেরা! অশোক ও দীপক—আর আশা নেই—ভরসা নেই, আবার আমরা তুরেগ-দস্যুদের হাতে বন্দী হ'তে চল্লেম।

দশম অধ্যায়

ভয়ানক বিপদ

অশোক ও দীপক মিঃ হ্যাডেনের মুখে এই আকস্মিক বিপদের কথা শুনিয়া বিচলিত হইয়া পড়িল! আবার বন্দী! একথা ভাবিতেও তাহাদের প্রাণ শিহরিয়া উঠিয়াছিল। দুইজনে—অপলকে নিশ্চল ভাবে - নীরবে দাঁড়াইয়া তুরেগদের দিকে চাহিয়া রহিল।

যদি অন্য সময় হইত তাহা হইলে হয়ত বা তাহারা এইরূপ বিপদের মুখে পড়িয়া একেবারে মুষ্ড়াইয়া যাইত না, কিন্তু ত্রিপলির কাছাকাছি আসিয়া—মুক্তি যখন অতি নিকটে—একেবারে হাতের কাছে, সে সময়ে আবার বিপদের মুখে পড়িবার আশঙ্কায় তাহাদের হৃদয় ও মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বোধ হয় এইরূপ নিরাশ হওয়া মানুষমাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক।

সত্য কথা বলিতে কি, যে উপায় ও মতলব স্থির করিয়া তাহারা এতটা পথ আসিয়াছে, ঠিক্ সেই সময়েই কিনা সমুদয় আশার প্রদীপটি নিবিয়া যাইতে বসিয়াছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত যদিও বা তুরেগ-দস্যুরা তাহাদের না দেখিয়া থাকে, তাহা হইলেও---আর একটু পরেই তাহারা তাহাদের দৃষ্টি-পথে পড়িবে। কেন না---কূপের ধারের এই খেজুর গাছ কয়টি ত আর তাহাদিগকে তুরেগদের চোখের সম্মুখ হইতে আড়াল করিয়া রাখিতে পারিবে না। আর পলাইবার পথই বা কোথায়? পলাইতে যাওয়া অর্থে তুরেগদের সন্দেহ আরও বাড়াইয়া দেওয়া মাত্র। যদিও বা তুরেগেরা তাহাদের এই নূতন পোষাকে হঠাৎ চিনিতে না পারে, কিন্তু মিঃ হ্যাডেন্‌কে তাহারা এ কয়েক বৎসর যাবত ক্রমাগত দেখিয়া আসিতেছে, কাজেই তাঁহাকে চেনা ত এতটুকু কঠিন হইবে না।

অশোক ও দীপকের মনে হইল---আর তাহাদের রক্ষা পাইবার কোনও উপায় নাই, মৃত্যু সুনিশ্চিত!

তাহাদের জীবন-দীপ নিবিবার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে।

অশোক ও দীপক যতই দুশ্চিন্তা করুক না কেন, মিঃ হ্যাডেন্ এই বিপদের সম্মুখেও তাঁহার চরিত্রের স্বাভাবিক দৃঢ়তার সহিত অটল অচল ভাবে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মিঃ হ্যাডেন্ গম্ভীর ভাবে কহিলেন,--শোন অশোক, শোন দীপক, আমরা যদি এখানে নিশ্চেষ্ট ভাবে কূপের পাশে বসে থাকি তা হলেও এদের হাতে পড়বোই, আর যদি চল্‌তে থাকি, তা হলেও এদের চোখ এড়াতে পারবো না, তার চেয়ে চল, আমরা রওনা হই, দেখা যাক্ কি হয়! হাল ছেড়ে বসে থাকলে ত আর চল্‌বে না!

দীপক কহিল---তারা কি আমাদের দেখে চিনে ফেল্‌বে না?

মিঃ হ্যাডেন্ হাসিয়া বলিলেন, --চেয়ে দেখ দেখি, আমাকে চিন্‌তে পার কি না? তিনি চুপি চুপি এই কথা কয়টি বলিয়া --একবার অশোকের ও দীপকের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া সুধু এই কথা কয়টি বলিলেন। তাহারা দুই ভাই সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল যে মিঃ হ্যাডেন্ যাহা বলিলেন, তাহা সত্য,—একটা পীতবর্ণের রেশমি কাপড়ের তৈরী মুখোশ্ দিয়া তিনি মুখ ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন, তারপর চোখে নীল রঙের চশমা পরিয়াছেন, মরুযাত্রীরা

ধূলির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এইরূপ চশমার ব্যবহার করিয়া থাকে। হ্যাডেন্ আবার বলিলেন,—কেমন ঠিক্ হয়েছে ত? আমায় এখন চিন্‌তে পারো!

অশোক ও দীপক একসঙ্গে বলিল—না! মিঃ হ্যাডেন্ বলিলেন—তোমরা একটা কাজ কর দেখি! তোমাদের ঢোলা জামাটা ঘুরিয়ে এনে মুখের উপর ফেলে দাও। তা হলে তোমাদের মুখ দেখা যাবে না,—তুরেগেরা এতে কোন সন্দেহও করবে না,—কেন জান? মরুভূমির পথে যারা চলাফেরা করে তারা ধূলির হাত থেকে বাঁচবার জন্য অনেকেই এরূপ মুখ ঢেকে চলে কিনা!...

অশোক ও দীপক মিঃ হ্যাডেনের কথানুযায়ী তাহাদের মুখ ঢাকিয়া ফেলিল!

মিঃ হ্যাডেন্ বলিলেন, আর দেরী করা নয়, চল এবার রওয়ানা হই!

পলকমধ্যে তাহাদের উট আবার তাহাদিগকে লইয়া মরুভূমির পথে অগ্রসর হইল। তাহাদের হৃদয় যে দুরু দুরু করিতেছিল একথা না বলিলেও চলে, কিন্তু এক নিমেষের জন্যও তাহারা তাহাদের হৃদয়ের বল হারায় নাই

তুরেগেরাও কূপের পাশে বিশ্রাম করাই মনস্থ করিয়াছিল, তাই তাহারা বরাবর ঘোড়া ছুটাইয়া এদিকেই আসিতেছিল। কাজেই দুইদল ক্রমশঃই পরস্পরে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

দলটি যখন অতি কাছে আসিয়া পড়িল, তখন মিঃ হ্যাডেন্ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে প্রেরিত অনুসরণকারী দলের আটাশ জন লোকের মধ্যে পাঁচজন নাই, আর সাতজন আহত। অশোক ও দীপক সেই দলের মধ্যে তাহাদের বন্ধু এমিনা আছে কিনা লক্ষ্য করিল, কিন্তু তাহাকে সেই দলের মধ্যে দেখা গেল না। কে জানে সে যুদ্ধে হত হইয়াছে কিনা!

অশোক ও দীপকের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, এইরূপ বিপদের মুখে পড়িয়া আর তাহাদের বাঁচিবার আশা কোথায়?

তুরেগদের দল আরও কাছে আসিলে পর দেখা গেল যে দলের মধ্যে একটি লোক বেশী। দলের পাঁচটি উট আগে আগে আসিতেছিল, তারপর তুরেগরা সব ঘোড়ায় চরিয়া আসিতেছিল। ঐ লোকটি সম্মুখের একটা উটের পিঠে বসিয়াছিল। তুরেগেরা যখন

অতি কাছে আসিয়া পড়িল, তখন অশোক ও দীপক ঐ লোকটাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। কি ভীষণ, বীভৎসমূর্ত্তি! যেন একটা জীবন্ত নরকঙ্কাল! মাথাটা ধূলি ধূসরিত উস্কখুস্ক চুল! চোখ দুটি কোটরে ডুবিয়া আছে। নাক্‌টা চেপ্টা! গায়ের রঙ যেন নিগ্রোদের রঙকেও হার মানায় এমনি কালো! একটা ছেঁড়া কাপড় পরা! লোকটার বাঁ গালে একটা দগ্‌দগে লাল ক্ষত-চিহ্ন!

মিঃ হ্যাডেন্ এই লোকটাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার বলিষ্ঠ হৃদয়ও যেন কি এক অজানা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। তিনি পূর্ব্বে এই লোকটাকে কখনও দেখেন নাই। তিনি চুপি চুপি বলিলেন—বাছারা! ব্যাপারটা বড় সুবিধের নয়, এই লোকটাকে দেখে আমার ভয় হচ্ছে! শুনেছি তুরেগেরা ভূতপ্রেত দৈত্যদানা, ওঝা এসকলে খুব বিশ্বাস করে, বোধ হয় এ লোকটা ওরকম ধরণের কিছু হ'বে! -ওঝা টোঝা বা জ্যোতিষী!

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই তাঁহারা তুরেগদের মুখোমুখি আসিয়া পড়িয়াছিলেন। সম্মুখে তুরেগ-সর্দ্দার ছিল, সে কোনরূপ সন্দেহ করিল না। এই তুরেগেরা হয়ত বা মনে করিয়াছিল যে মরুভূমিতে সচরাচর যেরূপ হয়, হয়ত সেইরূপ একজন আরব বণিক্ তাহার দুই পুত্র লইয়া ত্রিপলি চলিয়াছে। মরুভূমির মধ্যভাগে এইরূপ তিনজন যাত্রীর চলাফেরাটা মরুযাত্রীদল সন্দেহের চক্ষে দেখিলেও এক্ষেত্রে তাহারা সন্দেহের কোন কারণই দেখিল না! কেন না ত্রিপলির কাছাকাছি এইরূপ দু'তিনজন যাত্রী প্রায়ই দেখা যায়! এখানে ত আর বিপদের কোন আশঙ্কা নাই।

মিঃ হ্যাডেন্ কি ভাবে এই বিপদের মুখে দাঁড়াইতে হইবে, সেই সঙ্কল্প স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এবং যাহাতে তুরেগেরা কোনরূপ সন্দেহ করিতে না পারে, সেজন্য প্রথমেই তিনি তুরেগদের বলিলেন -বন্ধুগণের যাত্রা শুভ হউক! মিঃ হ্যাডেন্ এ কথা কয়টি এমন বিকৃতকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন যে অশোক ও দীপক পর্য্যন্ত সে স্বর চিনিতে পারিল না।

মিঃ হ্যাডেন্ যেমন কথা বলিতেছিলেন, তেমনি বেশ কৌশলের সহিত উটটিকে জোরে জোরে চালাইয়া নিতেছিলেন, তিনি বুঝাইয়া দিতেছিলেন যে—যেন অপেক্ষা করিবার সময় তাহাদের নাই!—

তুরেগদের মধ্য হইতে একজন মিঃ হ্যাডেনের কথায় বলিল—আপনার যাত্রা শুভ হউক!—আপনি ত্রিপলি যাচ্ছেন ত? আজ্ঞে হাঁ,—আমাদের দুর্ভাগ্য যে আপনারা সেদিকে যাচ্ছেন না, যদি যেতেন, তাহ'লে বেশ হ'ত, একসঙ্গে যাওয়া যেত। আপনাদের সঙ্গে গেলে আমাদের কোন ভয়ের কারণও থাকৃত না! কিন্তু আপনারা চলেছেন দক্ষিণ দিকে, কি আর করা, আমাদের অদৃষ্ট!

হাঁ, আমরা দক্ষিণেই যাচ্ছি।—আপনাদের যদি তেমন তাড়াতাড়ি না থাকে, তাহ'লে চলুন না একবার কূপটার পাশে, সেখানে আমরা একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করবো, জল টল খেয়ে আবার যে যার পথে রওয়ানা হব।—কি বলেন বন্ধু!

মিঃ হ্যাডেন্, নিমেষের জন্য বিচলিত হইলেন, কি যে করিবেন, ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতেছিলেন না! অশোক ও দীপক তাঁহার সহিত তুরেগদের কি কথা হইতেছিল, সেদিকে বড় একটা লক্ষ্য করে নাই। তাহারা তাহাদের মুখ ঢাকিয়া চুপ্ চাপ্ বসিয়াছিল।

নিমেষের জন্য সুচতুর ও সাহসী মিঃ হ্যাডেন্, তুরেগের অনুরোধ রক্ষা করিবেন কিনা তাহাই ভাবিতেছিলেন,—কেন না তুরেগদের মধ্যে একটা প্রথা আছে যে—যত বড় শত্রুই হউক না কেন, যদি তাহারা তাহার সহিত একবার পান-ভোজন করে তাহা হইলে আর তাহার সহিত কোনরূপ শত্রুতা করে না! —কিন্তু শেষটায় সিদ্ধান্ত করিলেন যে না—না তা হইতে পারে না।

কেন হইতে পারে না, তাহার প্রধান কারণ এই যে রৌদ্র ও বালুর অজুহাতে অশোক ও দীপক তাহাদের মুখ ঢাকিয়া আছে, তাহাতে সন্দেহের কোনও কারণ নাই, কিন্তু খেজুর গাছের ছায়ায় যাইয়া কূপের পাশে বসিয়া কোন্ অজুহাতে তাহারা তাহাদের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে? তারপর তুরেগী ভাষায় যখন কথা বলিতে পারিবে না, তখন আর কি ভাবে গোপন করা চলিবে?

মিঃ হ্যাডেন্ তাঁহার চিত্ত দৃঢ় করিয়া ফেলিলেন, না—না তা হইতে পারে না, এখন কোনরূপে তুরেগদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়াই হইল তাহার একমাত্র লক্ষ্য।

মিঃ হ্যাডেন্ সেই তুরেগের প্রস্তাবের উত্তরে বলিলেন—বন্ধু! আপনার প্রস্তাবটি অতি উত্তম। তৃষ্ণার্ত্ত উটের কাছে জল যেমন প্রার্থনীয়, আপনার এ প্রস্তাবটিও তেমনি—

অতি চমৎকার! আপনাদের সঙ্গে একত্র পান-ভোজন যে আনন্দের হ'ত তা বলাই বাহুল্য, কিন্তু কি করবো, আমাদের দেশে ভয়ানক বসন্ত রোগ হচ্চে, আমরা তাই দেশ ছেড়ে চলেছি, কে জানে আমরাও যে রোগের ছোঁয়াচ নিয়ে যাচ্ছিনে!

এই একটি কথায় আশানুরূপ ফল ফলিল! তুরেগেরা বসন্ত রোগকে বড় ভয় পায়, সময় সময় তাহাদের মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত হইয়া দলে দলে লোক প্রাণ হারায়, কাজেই তুরেগ-সর্দ্দার মিঃ হ্যাডেনের কথায় ভীত ও চমকিত হইয়া উঠিল এবং ব্যস্ত সমস্ত ভাবে কহিল—ঠিক্ কথা বলেছ ভাই, এই দুরন্ত পীড়া যে কি ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, সে কথা বলা বড় কঠিন! আপনারা তাড়াতাড়ি চলে যান! ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।

দলের অন্যান্য লোকেরাও তুরেগ-সর্দ্দারের কথাই সমর্থন করিল। এবং দলের সকলেই মিঃ হ্যাডেন্ এখন তাড়াতাড়ি তাহাদের কাছ হইতে চলিয়া যান এ ইচ্ছাটাই প্রকাশ করিতে লাগিল। যেমন তাহারা সাগ্রহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, তেমনি অতি বড় ত্রস্ততার সঙ্গে তাহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য উন্মুখ হইল। মিঃ হ্যাডেন্ সহজে বিপন্মুক্তির সুযোগ পাইয়া প্রাণ ভরিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

বিধাতা বুঝি অলক্ষ্যে হাসিতেছিলেন! আর এক মুহূর্ত্ত কাল—এক মুহূর্ত্ত কাল পরেই মুক্তি—নিরাপদ মুক্তির প্রত্যাশায় উটটার মুখ ফিরাইয়া মিঃ হ্যাডেন্ যেমন বেগে উটটাকে চালনা করিতেছিলেন, ঠিক্ সেই সময়ে এক আকস্মিক বিপদ ঘটিয়া গেল।

দীপক সারাক্ষণ তাহার মুখের আবরণীর একটা ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে এতক্ষণ পর্য্যন্ত কি কি ঘটিতেছিল, তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল, হঠাৎ বাতাস জোরে বহিবার দরুণ,সেই কাপড়টা উল্টাইয়া আসিয়া তাহার সারা মুখটা সম্পূর্ণ ভাবে ঢাকিয়া ফেলিল। ইহাতে দীপক আর কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। -হঠাৎ দীপকের কেমন একটা অসহিষ্ণুতা এবং ক্রোধের সঞ্চার হইল যে সে হাত দিয়া সেই কাপড়টা সরাইতে যাইয়া মাথার পাগড়ীটা পর্য্যন্ত উল্টাইয়া ফেলিল। অদৃষ্টের এমনি পরিহাস, যে ঠিক্ সেই সময়ে—ঐ যে ভীষণদর্শন কুৎসিত কদাকার লোকটা, তাহার নজর পড়িয়া গেল একেবারে দীপকের মুখের উপর। সুন্দর গৌরবর্ণ মুখ, এলোথেলো মাথায় চুল দেখিয়া লোকটার আর চিনিতে বাকী রহিল না যে—এরা ত তুরেগ নয়!

সেই কুৎসিত লোকটা—হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া ভীষণ ভাবে চীৎকার করিয়া বলিল —ঐ যে পালায় ! ঐ যে পালায় ! গুলি কর, মেরে ফেল ! মেরে ফেল !—ঐ যে—

মাথার পাগড়ীটা পর্যন্ত উল্টাইয়া গেল

সেই মুহূর্ত্তেই দ্রুম্ করিয়া একটা বন্দুকের আওয়াজ হইল। মিঃ হ্যাডেন্ বুঝিলেন যে আর কিছু গোপন রহিল না, সব প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। তাই তাড়াতাড়ি ঐ কদাকার লোকটা যে উটের উপর চড়িয়াছিল, সেই উটের পায়ের দিকে একটা গুলি করিলেন।

উটটা গুলি খাইয়া ভীষণ চীৎকার করিয়া এমন জোরে লাফাইয়া উঠিল যে সেই আরোহীটি তৎক্ষণাৎ ঘূর্ণীপাক খাইতে খাইতে উটের পিঠ হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। এই সুযোগে মিঃ হ্যাডেন্ অনেকটা পথ চলিয়া আসিলেন।

এদিকে তুরেগেরা তাহাদের সঙ্গীকে ঐ ভাবে বালির মধ্যে চিৎপাত হইয়া পড়িতে দেখিয়া মনে করিল যে লোক... গুলি খাইয়া মারা পড়িয়াছে। কিন্তু পরে তাহার কাছে যাইয়া দেখিতে পা... পক্ষে তাহার কিছুই হয় নাই। মিঃ হ্যাডেন্—বেগে উট চালাইয়া তুরেগদের কাছ হইতে প্রায় এক মাইলেরও বেশী পথ চলিয়া আসিয়াছিলেন।

তাহাদের সঙ্গীকে পুনরায় উটের পিঠে তুলিয়া লইয়া তুরেগেরা অতি বেগে তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। তুরেগদের আরবী ঘোড়া মরুভূমির পথেও কোন প্রকারেই দ্রুত গমনে উটের চেয়ে কম নয়। ঘোড়ার ক্ষুরের ঘায়ে আকাশ ধূলিতে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। অশোক ও দীপক শুনিতে লাগিল, কি ভীষণ ভাবে—ঐ কুৎসিত লোকটা

চীৎকার করিয়া বলিতেছে—মেরে ফেল! মেরে ফেল! এই তিনটা লোককে মেরে ফেল! তুরেগদের এই ভাবে উত্তেজিত করিবার কোনও কারণ ছিল না। একে ত স্বাভাবিক ভাবেই তাহারা দুরন্ত ও দুর্দ্দান্ত, তাহার পর এইরূপ একটা সুযোগ পাইয়াছে, কাজেই রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের মত তাহারা নিরীহ যাত্রী তিনজনকে আক্রমণ করিবার জন্য বেগে ছুটিতে লাগিল।

তুরেগ-সর্দ্দার মিঃ হ্যাডেন্ এবং অশোক ও দীপকদের উটটিকে লক্ষ্য করিয়া একটা গুলি ছুড়িল। একটা চলন্ত জিনিষকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করা বড় কঠিন। কিন্তু শিকারে অভ্যস্ত তুরেগ-সর্দ্দারের নিক্ষিপ্ত গুলি দীপকের কাণের কাছ দিয়া সোঁ-সোঁ শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল। এদিকে এই গুলির পর উটের গতি শ্লথ হইয়া পড়িল। আর একটা বন্দুকের শব্দ—অমনি একটা গুলি উটের পায়ে আসিয়া লাগিল। আহত উটটি ভীষণ ভাবে করুণ-স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। সে বালির মধ্যে পা ছুঁড়িতে লাগিল,—এদিকে মিঃ হ্যাডেন্ও চুপ করিয়া ছিলেন না, তিনিও নিকটবর্ত্তী তুরেগ-সর্দ্দারের ঘোড়াটাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িলেন! দ্রুম্ করিয়া শব্দ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সর্দ্দারের ঘোড়াটা চারি হাত উচুতে লাফাইয়া উঠিয়া ভীষণ হিঁ হিঁ হিঁ করিয়া চেঁচাইতে ও লাফাইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য তুরেগ-অশ্বারোহীদের ঘোড়াগুলিও অনুরূপ শব্দ করিতে লাগিল।

ঘোড়াগুলির লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি ও বিকট শব্দে চারিদিক একেবারে তোলপাড় হইতে লাগিল! মিঃ হ্যাডেন্দের উটটি—ঘোড়াগুলির এইরূপ চেঁচামেচিতে উত্তেজিত হইয়া অতি দ্রুত ছুটিতে লাগিল এবং একটি অনুচ্চ বালিয়াড়ির উপর আসিয়া উঠিল। বালিয়াড়ির উপর উঠিলে পর তাহারা দেখিতে পাইলে দূরে একটা প্রাচীর ঘেরা দুর্গের চূড়ার মত দেখা যাইতেছে। চূড়াটা দেখিতে অনেকটা চিমনির মত। মনে হইতেছিল যেন কোন অতি পুরাণো দুর্গের ধ্বংসচিহ্ন হইবে।

মিঃ হ্যাডেন্ এই ধ্বংসাবশেষটির দিকে তাকাইয়া বলিলেন—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, তোমরা! আর ভয় নাই, যদি আমরা কোনরূপে পুরাণো ঐ বাড়ীটার কাছাকাছি পৌঁছিতে পারি তবেই নিরাপদ হ'তে পারি।

হায়রে অদৃষ্ট! তাহারা কি অতটা দূরে যাইয়া পৌঁছিতে পারিবে। আহত ও উত্তেজিত উটটি হঠাৎ অনেকটা বেগে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এই উটের গতি ও তার জীবনের উপরই যে তাহাদের সব নির্ভর করিতেছে। ধরা পড়িলে এই অবস্থায় যে তাহাদের কিরূপ শোচনীয় পরিণাম হইবে এইবার তাহারা তাহা বিশেষরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিল।

মরণের যাত্রী তাহারা—মরণের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য এই তাহাদের শেষ উদ্যম! উট চলিতেছে—ধীরে মন্থর গতিতে! এখনও প্রায় এক পোয়া মাইল দূরে তাহাদের নিরাপদ আশ্রয় মিলিবার সম্ভাবনা! তুরেগেরা তাহাদের অশ্ব সংযত করিয়া বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহারা উন্মাদের মত গুলি ছুঁড়িতেছে লক্ষ্যহীন ভাবে। কোনটি বা তাহাদের মাথার কাছ দিয়াও ছুটিতেছে। আর ত বেশী দূরে নয়, দুইশত গজ মাত্র! এই পথটুকু কি তাহারা নিরাপদে পৌঁছিতে পারিবে না।

এদিকে হঠাৎ উটটা অবসন্ন হইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবার মত হইল! মিঃ হ্যাডেন্ চীৎকার করিয়া বলিলেন,—অশোক, দীপক,—খাবার থলেটা, আর জলের থলিটা নিয়ে তাড়াতাড়ি লাফিয়ে পড়—তারপর দৌড়ে ঐ ভাঙ্গা বাড়ীর গেটের দিকে যাও, আমি পরে আস্‌ছি—আর দেরী নয়! আর দেরী নয়!...

অশোক ও দীপক মিঃ হ্যাডেনের নির্দ্দেশমাত্র আর ক্ষণমাত্রও কালবিলম্ব না করিয়া বেগে সেই পুরাণো দুর্গের গেটটার দিকে ছুটিয়া চলিল!

তাহারা যেমন পতনোন্মুখ সিংহদরজাটার ভিতর মাত্র প্রবেশ করিয়াছে, এমন সময় আবার শোনা গেল গুড়ুম্ —গুড়ুম্—বন্দুকের আওয়াজ! মিঃ হ্যাডেন্‌ও তুরেগদের লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন। তাবপর আবার একটা বন্দুকের শব্দ! সঙ্গে সঙ্গে মিঃ হ্যাডেন্ অতি দ্রুত গেটের দিকে ছুটিয়া আসিলেন—তিনি কেবল দরজার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময় আর একটি বন্দুকের শব্দ গুড়ুম্! তারপর—তারপর কোনরূপ বেদনাসূচক বাক্য প্রকাশ না করিয়া—মিঃ হ্যাডেন্ উপুড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

একাদশ অধ্যায়

শেষ জলবিন্দু

মিঃ হ্যাডেন্‌কে ঐ ভাবে পড়িতে দেখিয়া অশোক ও দীপক তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ভিতরে টানিয়া আনিয়া দরজার প্রবেশ-পথটা কতকগুলি পাথর জড় করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—তুরেগেরা আর এদিকে অগ্রসর হইল না। কিন্তু তাহাদের কাছে আরও বিস্ময়ের কারণ হইল যখন মিঃ হ্যাডেন্ গা হাত পা নাড়াচাড়া করিয়া যেন কিছুই হয় নাই এমন ভাব দেখাইয়া উঠিয়া বসিলেন। তুরেগদের নিক্ষিপ্ত গুলিটা তাঁহার কনুইর কাছ দিয়া মাত্র গিয়াছিল উহাতে সামান্য একটু ছড়িয়া যাওয়া ব্যতীত আর কিছুই হয় নাই।

অশোকের নজর হঠাৎ জলের থলির দিকে পড়িবামাত্র সে দেখিল যে—একটা তীক্ষ্ণ পাথরের আঘাত লাগিয়া জলের থলিটা ছিদ্র হইয়া গিয়াছে এবং সব জল গড়াইয়া

পড়িতেছে। উহা দেখিতে পাইয়া সে তাড়াতাড়ি জলের থলিটি উল্টাইয়া ধরিল, যদিই বা সামান্য কিছু জল সঞ্চিত থাকে। জলের ত এই অবস্থা, এদিকে তাহাদের যে সামান্য খাদ্য অবশিষ্ট ছিল, তাহাও প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল।

মিঃ হ্যাডেন্ বলিলেন—জল আর খাবারের জন্য ভেব না, যা আছে, তাতে কোন রকমে আজকের দিনটা চলে যাবে। কাল কি হবে কে জানে! তুরেগেরা এদিকে পা বাড়াবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্তে পারো। এখানে যদি রাশি রাশি সোনার মোহর ও টাকাকড়ি গড়াগড়ি যেত, তা হ'লেও নয়।—অশোক ও দীপক একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল কেন বলুন দেখি?

তুরগেরা এ কেল্লাটাকে হানাবাড়ী বলিয়া মনে করে।

এখন তুরেগদের কথা শোন। তাহারা যখন কোন রকমেই এই তিন জন লোকের কোনও ক্ষতি করিতে পারিল না, তখন এদিকে আসাটা আর আবশ্যক মনে করিল না। যে একুশজন লোক এখন তাহাদের দলে ছিল, তাহার মধ্যেও দুইজন এই গোলযোগে মারা গিয়াছে,—কাজেই দলের শক্তি হ্রাস করা অপেক্ষা কিছুকাল চুপ্‌চাপ্ থাকাই তাহাদের কাছে সঙ্গত মনে হইয়াছিল। এজন্য তাহারা সকলে মরূদ্যানে আসিয়া খর্জ্জুরকুঞ্জের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে লাগিল।

মিঃ হ্যাডেন্ ও বালকেরা কিছুক্ষণের জন্য নিরাপদ হইলেন। মিঃ হ্যাডেনের শরীর যেন লৌহে গঠিত, এত বিপদের মধ্যে পড়িয়াও তিনি এতটুকু বিচলিত হ'ন নাই। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও তাঁহার জীবন ছিল মৃত্যুর মুখে, সে জীবন যে আবার ফিরিয়া পাওয়া যাইবে, সে সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না, কিন্তু সে দিকে তাঁহার এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি অশোকের কাছ হইতে খাবার জিনিষের থলেটা লইয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে খাইতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার এই ভাব দেখিয়া মনে হইল যে—তিনি যেন ইউরোপের কোনও সহরের একটি প্রধান হোটেলে পরম আনন্দে অবস্থান করিতেছেন।

এদিকে অবস্থাটা যে তাহাদের কত বড় শোচনীয় তাহা মনে ভাব। উটটি মারা গিয়াছে, তুরেগদের একটা উট কোন রকমে সংগ্রহ করিতে না পারিলে আর উপায় নাই।

উট না পাইলে হাঁটিয়াই তাহাদের পথ চলিতে হইবে। মরুভূমির মধ্য দিয়া পায়ে হাঁটিয়া চলা যে কি ভীষণ, তাহা যে কল্পনাও করা যায় না।

তুরেগদেরও আর কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। কে জানে কখন কোন্ পথে আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। অশোক ও দীপক এইবার একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের মনে আর কোনও আশা ছিল না। মিঃ হ্যাডেন্, তাহাদের এইরূপ বিমর্ষ ভাব দেখিয়া কহিলেন—তোমরা এমন মুষ্ড়ে পড়েছ কেন? আমরা আমাদের যতটুকু সাধ্য করেছি। এখন সবটা ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর। যা হবার হবে।

অশোক ও দীপকের মনে মিঃ হ্যাডেনের এই উৎসাহপূর্ণ বাক্য, নূতন উদ্দীপনা আনিয়া দিল। তাহারা ছেলেবেলা, তাহাদের বাবার মুখে একটি বাউলের গান শুনিয়াছে সে গানটি আজ তাহাদের মনে পড়িল,—

ওরে হাল ছেড় না, ভয় করো না
পারবারে যেতে বাইয়া
ভাঙ্গা নাও যে বাইতে পারে
তারে বলি নাইয়া!

দুই ভাই বেশ আনন্দের সহিত খাওয়া দাওয়া শেষ করিল। তারপর যখন শীঘ্র আর তুরেগদের হাতে আক্রান্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, এ কথাটা বিশেষভাবে জানিতে পারিল, তখন তাহাদের মনে ভরসা হইল! তখন তাহারা সেই ভাঙ্গা বাড়ীটার চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল।

এই ভাঙ্গা বাড়ীটা দেখিবার মত বটে। নীচের দিকের দেয়ালটা এখনও বেশ মজবুত আছে। পাথরের গাঁথুনি খুবই দৃঢ় রহিয়াছে। বাড়ীটার এখানে সেখানে পাথরের থাম, ঘরের চিহ্ন, বারান্দায় অলিন্দ, রোয়াক, সিঁড়ি সব অটুট রহিয়াছে। দুর্গবাড়ীটি বৃত্তাকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে, তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে যখন এই দুর্গবাড়ীটি নূতন ছিল, তখন ইহার স্থাপত্য-সৌন্দর্য্য বড় কম

ছিল না। প্রাচীরের মধ্যে চারিদিক ঘিরিয়া বারান্দা, বারান্দার পর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে যে অনেকগুলি কক্ষ ছিল, তাহা এখনও বেশ বুঝিতে পারা যায়।

ঠিক্ মাঝখানে একটি উচ্চ স্তম্ভ রহিয়াছে। স্তম্ভটি প্রস্তর-নির্ম্মিত। প্রস্তরখণ্ডগুলি অমসৃণ, এই অমসৃণ অথচ দৃঢ় প্রস্তরগুলি পর পর সাজাইয়া একটি বিরাট উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। এক সময়ে এই প্রাচীরবেষ্টিত প্রাসাদ ইত্যাদি কিসের জন্য ব্যবহৃত হইত কে জানে? সম্ভবতঃ রোমকেরা এখানে একটি দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রোমানদের পতনের সময় কে জানে কোন্ শত্রুদল ইহা ভাঙ্গিয়া চূরিয়া চূরমার করিয়াছে।

এই স্তম্ভটি বোধ হয় রোমানদের পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্তম্ভের উপর আরোহণ করিলে যোজনের পর যোজন বিস্তৃত মরুভূমির দৃশ্য আসিয়া চোখের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বোধ হয় সেকালে ইহার উপর আরোহণ করিয়া দুর্গবাসীরা মরু-যাত্রীদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিত, কে শত্রু, কে মিত্র তাহা চিনিয়া লইত! কাহাকে আশ্রয় দিতে হইবে, আর কাহাকে আক্রমণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে সে বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করিত। অশোক ও দীপক এই স্তম্ভটির উপরে উঠিতে চেষ্টা করিল এবং অনেক খুঁজিয়া উত্তর দিকে সিঁড়িটি খুজিয়া পাইল। দুইজনে উহার উপরে উঠিয়া দেখিল—অপূর্ব্ব দৃশ্য! পূর্ব্বদিকে দিগন্ত বিস্তৃত উষর প্রান্তর—উত্তর-পূর্ব্ব দিকে নীল গিরিশ্রেণী। মরুভূমির বিরাট বিস্তার এখান হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

তাহারা স্তম্ভটির উপর হইতে যখন নামিয়া আসিল সে সময় বাহির হইতে একটা চীৎকার শুনা গেল। কে—বা কাহারা বাহির হইতে চীৎকার করিতেছে, তাহা দেখিবার জন্য অশোক ও দীপক প্রাচীরের গা হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিতে পাইল যে—তাহারা পাথর ও শিলনুড়ি জড় করিয়া যেখানটায় ভাঙ্গা দরজার প্রবেশ পথটা রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে একজন দীর্ঘাকার তুরেগ একটা বল্লমের গায়ে সাদা নিশান বাঁধিয়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই সাদা নিশান, শান্তির চিহ্ন ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? আর একজন তুরেগ একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিল।

অশোক ও দীপক যেমন সেদিকে আসিতেছিল তখন শুনিতে পাইল—মিঃ

একাদশ অধ্যায়

হ্যাডেনের উচ্চ কণ্ঠস্বর! —তিনি তুরেগ দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাহারা কেন এখানে আসিয়াছে। তাহার চোখ দুইটি আগুনের মত জ্বলিতেছিল, যে তুরেগটা নিশান হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—মিঃ হ্যাডেন্ তাহার দিকে বন্দুকটি লক্ষ্য করিবামাত্র সেও তাহার সঙ্গীটি বেগে ছুটিয়া পলাইল। একবার পেছনের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

অশোক জিজ্ঞাসা করিল—মিঃ হ্যাডেন্ ব্যাপারটা কি বলুন ত?

মিঃ হ্যাডেন্ কিছুটা সময় চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—তোমাদের না শুনলেই ভাল হ'ত, এ লোক দু'টো এসেছিল এই কথা বল্‌তে যে—যদি আমি তোমাদের দু'ভাইকে ওদের হাতে ছেড়ে দিই, তা হ'লে ওরা আমাকে ত্রিপলি যাবার পথে আর কোন বাধা দেবে না।

অশোক হাসিয়া বলিল—আপনি কি বললেন—মিঃ হ্যাডেন্?

একটা সাদা নিশান লইয়া দাঁড়াইয়া আছে

আমি বললেম—যদি তারা এখুনি চলে না যায় তা হ'লে একে একে দু'জনাকেই গুলি করে মারবো। লোক দু'জনে বুঝলে যে আমি কথাটা নেহাৎ হাসি-তামাসা করে বলিনি, তাই এক পা দু' পা করে ছুটে পালাল। আমি বেঁচে থাক্‌তে তোমাদের বিপদে ফেলবো সে হ'বে না। আমরা তিনজনে যে পৃথিবীর মানুষ! দেশ, জাতি ও সমাজ কি মানুষের মিলনের কোন বাঁধা দিতে পারে। এই বলিয়া মিঃ হ্যাডেন অশোক ও দীপকের হাত সস্নেহে ধারণ করিলেন।

মিঃ হ্যাডেন্, বুদ্ধিমান্ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি, তিনি বালক দু'টিকে দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া মন খারাপ করিবার সুযোগ একেবারেই দিতেছিলেন না। তাহাদিগকে কোন না কোন একটা কাজে বিব্রত রাখাই তাঁর সঙ্গত মনে হইল।

মিঃ হ্যাডেন্ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—শুন্ছ অশোক, শুন্ছ দীপক, কেবল চুপ্-চাপ্ করে বসে থাক্লে চলবে না। এক কাজ কর দেখি। বাড়ীটার ভিতর ঘুরে ফিরে যেখানে যত শুক্নো কাঠ, পাতা রয়েছে সে সব জড় কর। তারপর সেগুলি স্তম্ভটির উপরে নিয়ে ওর চূড়ার উপর আগুন জ্বালিয়ে দাও।

যেমন বলা তেমন কাজ আরম্ভ হইয়া গেল।—তাহারা দুই ভাই সিঁড়ি বাহিয়া স্তম্ভের উপরে উঠিল। সিঁড়ির অনেক গুলি ধাপ ভাঙ্গিয়া চূরিয়া গিয়াছিল, তবু তাহারা কোনপ্রকারে উহার উপরে উঠিয়া আগুন ধরাইয়া দিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে আগুনের লোহিত শিখা আকাশের গায়ে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অনেক দূর হইতে সেই অগ্নিশিখা নিশ্চয়ই দেখা যাইতেছিল।

অশোক ও দীপক পরম উৎসাহের সহিত এই কার্যে প্রবৃত্ত হইলেও, তাহারা বার-বার উঠা-নাবা করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সারাপথে যে যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত, তারপর এই দুঃসহ যন্ত্রণা ও বেদনা, সিঁড়ি বাহিয়া বারবার উঠা-নাবার দরুণ তাহাদের এতদূর ক্লান্তি ও অবসাদ আসিয়াছিল যে, তাহারা স্তম্ভটির চূড়ায় আগুন জ্বালাইয়া দিয়া নীচে আসিয়া যেমন শুইয়া পড়িল, অমনি গাঢ় নিদ্রা আসিল, সারারাত্রি তাহারা বাড়ীর মত আরামে ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিল।

ভোরের দিকে দীপক এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল। তাহাদের তিনজনকে যেন তুরেগেরা আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে! দীপক—সে প্রাণপণে ছুটিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না! এমন সময় একটা ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিল।

সে যখন জাগিয়া চক্ষু মেলিল, তখন তাহার মনে হইল যে বজ্রধ্বনিও হার মানিয়া যায় এইরূপ ভীষণ একটা শব্দ তাহার কানে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আর কে যেন দ্রুত-পদ-বিক্ষেপে ছুটিয়া আসিতেছে। আব সে শব্দটা গেটের বাহির হইতে আসিতেছে।

অশোকও জাগিয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল কে আপনি?

কোন ভয় নেই আমি অশোক! মিঃ হ্যাডেনের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। উত্তরটা গেটের বাহির হইতে শোনা গেল। অশোক তাড়াতাড়ি সেদিকে যাইয়া দেখিতে পাইল যে স্তূপাকৃতি শিলারাশির উপরে মিঃ হ্যাডেনের পা পিছ্‌লাইয়া গিয়াছে। আর তাঁহার গায়ের ঢোলা জামাটা একেবারে জলে ভিজিয়া গিয়াছে। অশোক তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল—একি! একি! আপনার এ দশা কেন? তুরেগেরা আপনাকে গুলি করিয়াছে নাকি? একি! আপনার গায়ে রক্ত?

মিঃ হ্যাডেন্ হাসিয়া বলিলেন—আমাকে কেউ গুলি করেনি,—তবে সব জল নষ্ট হয়ে গেছে। রাত্তিরে যখন দেখ্‌লেম যে আমাদের খাবার মত এক ফোঁটাও জল নেই, তখন চলে গেলাম ঐ কূপের কাছে, তুরেগদের একটা জলের থলি নিয়ে জল ভরে অনেকটা পথ চলে এসেছি, এমন সময় তুরেগেরা জান্‌তে পেরে আমার কাঁধ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল। ভাগ্যিস্ গুলিটা আমার গায়ে লাগেনি, থলেতে লেগে একেবারে সব জল নিঃশেষ করে ফেলেছে! আমার গায়ে সে জলের ধারাই দেখ্‌তে পাচ্ছ।

অশোক ও দীপক ব্যস্তভাবে একসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—সত্যি আপনার গায়ে গুলি লাগেনি? সত্যি বলছেন?

নিশ্চয় নয়!—আমার গায়ে গুলি লাগলে নেহাৎ মন্দ হ'ত না, আমি মরতেম বটে, কিন্তু জলটা নষ্ট হ'ত না! এইকথা বলিয়া মিঃ হ্যাডেন্ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হা-হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। —কি করবো বল, এত করেও তোমাদের জন্য জল যোগাড় করতে পারলেম না। যখন আকাশে সূর্য্য উঠিল, তখনও তুরেগদের চেঁচামেচি হৈ-চৈ-শব্দ শুনা গেল। আর দেখা গেল তাহাদের শিবির হইতে কুণ্ডলি পাকাইয়া পাকাইয়া ধোঁয়া আকাশে উড়িতেছে।

মিঃ হ্যাডেন্ বলিলেন—দেখ্‌তে পাচ্ছি, হতভাগারা সহজে যাচ্ছে না! কি করা যায় বলত! আজ রাতটাও ভয়ে ভয়ে কাটাতে হবে দেখ্‌ছি।—তাঁহার মনেও যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি না হইয়াছিল, তাহা নহে।

তারপর তাহারা তিনজনে মিলিয়া যে সামান্য খাদ্যদ্রব্য অবশিষ্ট ছিল, তাহা খাইয়া

নিঃশেষ করিল। —ওদিকে তুরেগেরা এই তিনটি প্রাণীকে গ্লানি, বিদ্রূপ করিতে এবং উত্তেজনাবশতঃ বিকট চীৎকার করিয়া তাহাদের মরণ অভিশাপ দিতেছিল।

দুই পক্ষই পরস্পর বন্দুক ছুড়িয়া এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছিল যে এইরূপ গুলি মারিয়া কেহ কাহারও কোনও ক্ষতি করিতে পারিবে না।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। কি ভীষণ সে সন্ধ্যা! উন্মত্ত ঝড় লইয়া সেদিন সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। লাল মেঘের ঢেউয়ের তলায় যেমন সূর্য্য পশ্চিমে ডুবিয়া গেল, তেমনি মনে হইতেছিল, যে বুঝি বা এই দিনশেষের সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জীবনও শেষ হইতে চলিয়াছে। পূর্ব্বদিনকার মত সেদিনও তাহারা সেই স্তম্ভের ছাদের উপর শুক্‌নো ডাল পাতা জড় করিয়া আগুন জ্বালিয়া দিয়া আসিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে—ঝড়ো হাওয়ায় আগুনের শিখা, সাপের জিহ্বার মত লক্ লক্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

মিঃ হ্যাডেন্, অশোক ও দীপককে বলিলেন—কে জানে আমরা বাঁচিব কিনা, শোন আমার একটা কথা, যদি আমি মারা যাই, তা হলে এক কাজ করো, নিউইয়র্ক সহরে—১০নং ওয়াশিংটন ষ্ট্রীটে আমার মা থাকেন, তাঁকে তোমরা আমার কথা বলো এবং সান্ত্বনা দিয়ো, বলো, যে আমি জীবনে কোন অন্যায় কাজ করিনি, বিপাকে পড়ে প্রাণ হারিয়েছি।

অশোক ওস্‌মান বেগের লিখিত চিঠির পেছনে মিঃ হ্যাডেনের বর্ণিত ঠিকানাটা সযত্নে লিখিয়া রাখিল।

এমন সময় সেই খর্জ্জুরকুঞ্জে তুরেগদের শিবির হইতে একটা ভয়ঙ্কর গোলমাল শোনা গেল, ঘোড়াগুলি চিঁহিঁ চিঁহিঁ করিয়া চেঁচাইতে লাগিল।

মিঃ হ্যাডেন্ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন শুন্‌ছো তোমরা—কি ভীষণ শব্দ শোনা যাচ্ছে! দূরে ঐ শোন পূবদিক্ হ'তে একটা অদ্ভুত রকমের আওয়াজ আস্‌ছে! বৃষ্টির শব্দের মত, শুক্‌নো পাতার মর্-মর্ শব্দের মত—শুনছো অই বিচিত্র ধ্বনি!

মিঃ হ্যাডেনের অনুমান মিথ্যা নয়। সত্য সত্যই একটা শব্দ শুনা যাইতেছিল। শব্দটা ক্রমশঃ নিকট হইতেও নিকটতর হইতে লাগিল। মিঃ হ্যাডেন্ উৎকর্ণ হইয়াছিলেন।

এইবার দৃঢ়স্বরে কহিলেন—আমি নিশ্চয় করে বল্‌ছি—একদল ঘোড়সোয়ার আস্‌ছে। যদি—

তাঁহার এই 'যদি'র পর আর কোন কথা বলা হইল না।

সেই স্তম্ভটির উপরকার অগ্নিশিখা নিবিবার পূর্ব্বে আবার জ্বলিয়া উঠিল, সেই আলো-ছায়ার মধ্য দিয়া দেখা গেল,---এক দল অশ্বারোহী বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, তার পর বন্দুকের শব্দ, করুণ চীৎকার ও হাহাকার মরুভূমির আকাশে ও বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আর সেই ছায়ালোকে দেখা গেল,—তুরেগেরা অতি বেগে মরুভূমির পথে পলায়ন করিতেছে।

দীপক—বলিল—বাবা!

দীপক আনন্দে প্রাণপণ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল -Hurrah! বা! কি মজা! কি মজা! আমরা মুক্ত! আমরা স্বাধীন!

এমন সময় কাহার যেন পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল ! কে যেন পরিষ্কার ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কে ?

দীপক আনন্দোৎফুল্লচিত্তে বলিল,—কে আপনি ? আপনি কি—মিঃ সার্প ?

অমনি দ্রুত পাদবিক্ষেপে অশোক, দীপক ও মিঃ হ্যাডেন্ দরজাটার কাছে আসিয়া স্তূপীকৃত শিল পাথর, নুড়ি সব সরাইয়া ফেলিল। ব্রিটিশ রাজদূত মিঃ সার্প তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করিয়া সস্নেহে দুই হাত দিয়া অশোকের দুইটি হাত ধরিলেন। এবং জড়িতস্বরে কহিলেন—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ !

কে আর একজন সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে ধীরস্বরে বলিলেন—ঈশ্বর, তুমি আছ ! তুমি মঙ্গলময়,—একথা সত্য !

এই শব্দে দীপক চমকিয়া উঠিল ! কাঁর এই স্বর ? এ স্বর যে অতি পরিচিত ! তবে কি ?—

দীপক—নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকের ক্ষীণ-দীপ্তিতে দেখিতে পাইল—দীর্ঘাকার একজন পুরুষ মেজরের পাশে দাঁড়াইয়া আছেন ! সে তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে যাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া দুই হাত দিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—বাবা !

দ্বাদশ অধ্যায়

শেষ-কথা

মিঃ স্মার্ট ত্রিপলি ফিরিয়া আসিয়া যখন অশোক ও দীপকের নিরুদ্দেশের কথা বলিলেন, তখন মিঃ সার্প অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। কি যে করিবেন, ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতেছিলেন না। এ সংবাদ শুনিবামাত্রই তিনি মাল্টাতে মেজর সেনের নিকট পত্র লিখিলেন—তাঁহাকে ত্রিপলিতে চলিয়া আসিবার জন্য।

এদিকে কাপ্তেন সেনও প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন, কিছুদিন তাঁহার কাছে এই দুঃসংবাদটা গোপন রাখা হইয়াছিল, পাছে এইরূপ একটা দুঃসংবাদে আবার তাঁহার পীড়া বাড়িয়া উঠে। কিন্তু কথাটা গোপন রহিল না,—কাপ্তেন সেন এই সংবাদ শুনিয়া একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন—তিনি সাহারার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। —তিনি বারবার বলিতে লাগিলেন,—কি দুর্দ্দিনেই যাত্রা করেছিলাম, কেবল বিপদের পর বিপদ! কে জানে ছেলে দু'টিকে ফিরে পাওয়া যাবে কিনা।

মিঃ সার্পের পত্র পাইয়া মেজর সেন ত্রিপলিতে চলিয়া আসিলেন—ভাইকে সান্ত্বনা দিলেন এবং মিঃ সার্পকে বলিলেন—অশোক ও দীপকের জন্য কোন চিন্তা করবেন না। —তাদের ফিরে পাই ভালই, না পেলেও কোন দুঃখ করবো না,—মানুষ Adventure করতে গিয়ে কত বিপদেই না পড়ে। তোমাদের ইংরেজ ছেলেরা জীবনকে তুচ্ছ করে মরণের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে এতটুকু ভয় করে না, আর বাঙ্গালীর ছেলেদের বুকে যদি তেমনই একটা সাহস ও প্রেরণা জেগে থাকে সে ত খুবই ভাল কথা! মিঃ সার্প, মেজর সেনের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন—যেমন বাপ্ তেমনি ছেলে, সে ত হবেই।

তুর্কী সৈন্যাধ্যক্ষ ওস্‌মান বেগ, মিঃ সার্প ও মেজর সেন তিনজনে নানা পরামর্শ করিয়া ছেলে দু'টির সন্ধানে বাহির হইলেন,—তাঁহারা কি ভাবে কেমন করিয়া অশোক ও দীপককে ফিরিয়া পাইলেন, সে কথা তোমরা জান। কিন্তু তাহারা কি ভাবে কোন্ পথে অগ্রসর হইয়া সফলকাম হইতে পারিয়াছিলেন, এইবার সেই কথা বলিতেছি।

আমরা যে সময়ের কথা বলিলাম, সে সময়ে ত্রিপলি ছিল তুর্কীদের অধীন। —ত্রিপলি উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী ত্রিপলিতানিয়ার রাজধানী। মূরদের একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর। এখান হইতেই মরুযাত্রিগণ—তিম্বাক্তু (Timbuktu), চাদ হ্রদ, দার্কুর প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিয়া থাকে। অতি প্রাচীনকালে ফিনিশিয়েরা, পরে রোমকেরা এবং শেষটায় আরবেরা ত্রিপলির অধিকারী ছিলেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে স্পেনের ফার্দিনান্দ ত্রিপলি অধিকার করেন, ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা সেণ্টজন নাইটসদের অধীনে ছিল (Knights of St. John)। তারপর ত্রিপলি তুর্কীদের হাতে আসে। ১৫৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তুর্কীরা ইহার অধিপতি ছিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ত্রিপলি ইটালির করতলগত হইয়াছে। ত্রিপলিতানিয়া (Tripalitania)র পরিমাণ ৩২০,০০০ বর্গ মাইল। সাহারা মরুভূমির অনেকটা ইহার অন্তর্ভূত। ইহার তিনদিক বেড়িয়াই সাহারা মরুভূমি।

তুর্কীদের অধীনে থাকিবার সময় তুরেগ-দস্যুরা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা তুর্কীদিগকে একেবারেই ভাল চোখে দেখিত না। আবার ফরাসীরাও তখন মরুভূমির উপর আপনাদের নিরাপদ অধিকার বিস্তার করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তুরেগ-

দস্যুরা ও যোদ্ধারা সর্ব্বদা ফরাসী সৈন্যের থানা আক্রমণ করিত, এমন কি দলবদ্ধ পর্য্যটকদিগকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাহারা যাত্রীদিগকে হত্যা করিয়া জিনিষপত্র লুঠপাট করিয়া পলায়ন করিত। দস্যুদের উটগুলির গতিও অত্যন্ত ক্ষিপ্র ছিল। কাজেই ফরাসী সৈন্যেরা সহজে তাহাদিগকে ধরিতে পারিত না। এই জন্য তাহারা সৈন্যসংস্কারে মন দিলেন এবং মরুভূমির উত্তরভাগে উষ্ট্রযূথ দেখিতে পাইলেই ফরাসীসৈন্য তাহাদের আক্রমণ করিত। এবং তাহাদের দলের দ্রুতগামী উটগুলি ধরিয়া আনিত। এই উষ্ট্রদলের নাম মেহারী। তারপর দেশীয় যুবকদের মধ্যে যাহারা উষ্ট্র চালাইতে সুদক্ষ তাহাদের সেনাদলভুক্ত করিয়া ফরাসীরা তুরেগদের দমন করিতে পারিয়াছিলেন। ফরাসীদের মত আগ্নেয়াস্ত্র তাহারা কোথায় পাইবে? কাজেই শেষটায় তুরেগেরা ফরাসীদের কাছে হার মানিয়া মরুভূমির মধ্য ও দক্ষিণ অংশে উষ্ট্র ও অন্যান্য পশুপাল চারণ করিয়া জীবনধারণ করিতেছে। এখন তাহাদের সেই দর্প, সেই তেজ আর নাই। ---এ অনেক পরের কথা।

তুরেগদস্যুরা যখন মরুভূমিতে সকলের ভীতি উৎপাদন করিয়া বাস করিতেছিল—সে সময়কার ঘটনা লইয়াই আমাদের এই গল্প লিখিত হইয়াছে।

এখন আমরা অন্যকথা বলিব।

* * * * * *

মিঃ সার্প অশোক ও দীপকের উদ্ধার ব্যাপারে যে বুদ্ধি ও কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয় বটে। Me-Guide-Hussein Aliর উপর তাঁহার বরাবর কেমন একটা সন্দেহ হইয়াছিল এবং অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাহার সে অনুমান সত্য। কিন্তু হঠাৎ তাহাকে কোনও সাজা দিতে গেলে—ভাল না হইয়া মন্দ হইবার সম্ভাবনাই বেশী বলিয়া তিনি হঠাৎ তাহার প্রতি কোনরূপ বিরূপ ভাব প্রদর্শন করেন নাই। শুধু ওস্‌মান বেগের নিকট তাহার সন্দেহের কারণটা বলিয়াছিলেন মাত্র।

কি ভাবে মিঃ সার্প একেবারে সঙ্কটমূহূর্ত্তে যাইয়া—অশোক ও দীপককে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন, এইবার সেই কথা শোন।

মিঃ সার্প চারিদিকে খোঁজ করিয়া যখন সঠিক্ ভাবে জানিতে পারিলেন যে তুরেগেরা অশোক ও দীপককে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে তখন হইতেই তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। হঠাৎ একটা সুযোগ মিলিল। একদিন তিনি সরকারি কার্য্যোপলক্ষে ঘরিয়ান্ পর্ব্বতশ্রেণীর অধিত্যকায় যে মূরসর্দ্দার বাস করিতেন, তাঁহার নিকট গিয়া জানিতে পারিলেন যে—তুরেগ-দস্যুরা আজকাল ভয়ানক অত্যাচারী হইয়াছে, উহাদের দমন করিতে না পারিলে,—এ অঞ্চলে বাস করা অসম্ভব। এমনকি দস্যুদল তাঁহার নিরীহ প্রজাদের উপর পর্য্যন্ত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।—মিঃ সার্প যদি তাঁহার সৈন্যদের দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে তাহার লোকজনেরাও তাঁহার অনুগামী হইবে। কথা-প্রসঙ্গে সর্দ্দার ইহাও জানাইলেন যে দুই দিন যাবত পোড়ো দুর্গ-বাড়ীর দিকে সন্ধ্যার পর একটা আলো দেখা যাইতেছে, —বোধ হয় কোন মরুযাত্রী বিপন্ন হইয়া সাহায্যের জন্য সঙ্কেত করিতেছে।

মিঃ সার্প এই কথাটা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং তাঁহার ইচ্ছা হইল যে ঐ দিক্‌টায় যাইয়া একবার অশোক ও দীপকের অনুসন্ধান করেন। এইরূপ মনে করিয়া তিনি ত্রিপলি হইতে তুর্কীসৈন্য, নিজের দেহরক্ষীদল এবং মূর সর্দ্দারের রক্ষিত প্রহরীদিগকে লইয়া নিজে এবং মেজর সেন দুর্গবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।—তাঁহাদের এই অভিযানের ফল যে কি হইল তাহা তোমরা জান। তাঁহারা এই অভিযানে বিজয়ী হইয়া —অশোক, দীপক ও মিঃ হ্যাডেন্‌কে লইয়া তাহাদের সেই ছদ্মবেশের অবস্থায়ই নির্ব্বিঘ্নে ত্রিপলিতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের কেহ চিনিতেও পারিল না। —তাহারা সকলে ব্রিটিশ রাজদূতের ওখানে রহিলেন। কথাটা বাহিরে গোপন রহিল।

মেজর সেন, কাপ্তেন সেন, মিঃ সার্প এবং ওস্‌মান বেগ মিঃ হ্যাডেনের মুখে তাহারা কি ভাবে তুরেগদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল, সে কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।

* * * * * *

—দীপক একদিন হাসিতে হাসিতে অশোককে বলিল—দাদা, একটা Adventure চেয়েছিলাম, তা বেশ হ'য়ে গেল।

অশোক কহিল—তা হ'ল বটে, কিন্তু মিঃ হ্যাডেন্‌কে না পেলেই হ'ত একেবারে

চূড়ান্ত। আমাদের রক্তধারা মরুভূমির মাটিতে শুকিয়ে যেত। বেচারী বাবা ও কাকার কথা ভাব দেখি, কি কষ্টেই না তাঁরা দিন কাটিয়েছেন। ধন্য মিঃ হ্যাডেন, মানুষ নন্ দেবতা! Mc-Guide-Hussein Alির সঙ্গে একবার দেখা হ'লে কিন্তু বেশ হ'ত।

* * *

আহাহা! বেচারা হোসেন আলি, সে কিন্তু জানিতেও পারে নাই যে যাহাদের তুরেগদের হাতে বন্দী করিয়া দিয়াছে, আজ তাহারা মুক্ত আজ তাহারা স্বাধীন এবং এই ত্রিপলিতেই আছে। ত্রিপলির শাসনকর্ত্তা—পাশা ছিলেন অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি সব কথা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধানের জন্য মনোযোগী হইলেন।

—একদিন হোসেন আলির পাশার দরবারে তলব পড়িল। হোসেন আলি সেখানে আসিলে, পাশা তাহাকে বেশ সদয় ভাবেই গ্রহণ করিলেন। পাশা বলিলেন -দেখ, হোসেন আলি, তুমি কি ঐ ছেলে দু'টির কোন খবর জান? যদি জান বল। আর মিঃ সার্পকে সাহায্য করো, তোমাকে খুব বখশিশ দিব।

চতুর হোসেন আলি পুরস্কারের লোভেও বিচলিত হইল না। সে কহিল—হুজুর! আমি কি করে জান্‌বো বলুন। তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, কি বল্‌বো, হুজুর, তুরেগেরা বাচ্চা সাহেবদের ধরে, আমারই সামনে—তরোয়াল দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে ফেল্‌লো।—উঃ!

পাশা গম্ভীর ভাবে কহিলেন---তাইত! একেবারে কুচি কুচি করে কেটে ফেলেছে!

—সত্যি তাই, হুজুর! এই দেখুন না, আমার কপালেও এমন ঘা বসিয়েছিল যে অল্পের জন্য বেঁচেছি। এখনও দেখুন না কেন মাথায় পটি বাঁধা রয়েছে। ভাগ্যিস্, আমার বরাত ভাল, তাই পালিয়ে বেঁচেছি।

পাশা হাসিলেন, এবং তার পর মুহূর্ত্তেই যেমন হাততালি দিলেন—অমনি তাঁহার সম্মুখের একটি কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা সরিয়া গেল। সকলে দেখিল—হোসেন আলি দেখিল—অশোক ও দীপক দুই ভাই হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

হোসেন আলির মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। পাশা বলিলেন—দেখা যাক্, তুরেগেরা দিয়ে তোমার কপালের কতটা কেটেছে। পাশার ইঙ্গিত মাত্র একজন প্রহরী

হোসেন আলির মাথার পটিটা ফেলিয়া দিল,—দেখা গেল তাহার কপালের কোথাও সামান্য আঁচড়টি পর্য্যন্ত নাই।

হোসেন আলির মুখ মড়ার মুখের মত বিবর্ণ ও মলিন হইয়া গেল। তবু—তবু সে কাঁপিতে কাঁপিতে ভগ্নস্বরে কহিল—সত্যি, হুজুর, আমি কোন অপরাধ করিনি। তুরেগেরা—

এমন সময় পাশের কক্ষ হইতে মিঃ হ্যাডেন্ বাহির হইয়া আসিলেন এবং হোসেন আলির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—আমায় চিন্‌তে পার, হোসেন্ আলি !

হোসেন আলি—আর মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছিল না, তবু সে ক্ষীণস্বরে কহিল—না, সাহেব, আপনাকে ত চিন্‌তে পারছি না।

মিঃ হ্যাডেন্ বজ্রকণ্ঠে বলিলেন—চিন্‌তে পার না ? তিন বৎসর আগে, কে আমাকে তুরেগদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল ? সেকি তুমি নও হোসেন আলি ?

পাশা মিঃ হ্যাডেন্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আপনার এই অভিযোগের মূলে কি কোন সাক্ষী আছে ?

মিঃ হ্যাডেন্ গর্ব্বিত ভাবে বলিলেন—হাঁ, আছে। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে আবার কৃষ্ণবর্ণ-যবনিকা সরিয়া গেল---কয়েকজন প্রহরী দুইজন ভীষণাকৃতি তুরেগকে বন্দী অবস্থায় পাশার সম্মুখে উপস্থিত করিল। ইহারা দুইজন মিঃ সার্পের এই অভিযানে বন্দী হইয়াছিল। হোসেন আলিকে দেখাইয়া, তাহারা মিঃ হ্যাডেনের কথার সমর্থন করিল।

* * *

বিচারে কোন কথা গোপন রহিল না। প্রকাশ পাইল যে হোসেন আলি অনেক দিন হইতেই বিদেশী পর্য্যটকদের এইভাবে মরুভূমির সেই পোড়ো বাড়ীটা দেখাইবার প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া পরে কৌশল করিয়া তুরেগদের হাতে সমর্পণ করে। হতভাগ্য বন্দীদিগকে তুরেগেরা হয় হত্যা করে, নতুবা ক্রীতদাসরূপে দূর দূরান্তরে বিক্রয় করে, কিংবা মুক্তিকর লইয়া ছাড়িয়া দেয়। হোসেন আলি এইভাবে অনেক অর্থ উপার্জ্জন ... একেবারে আসিতেছিল।